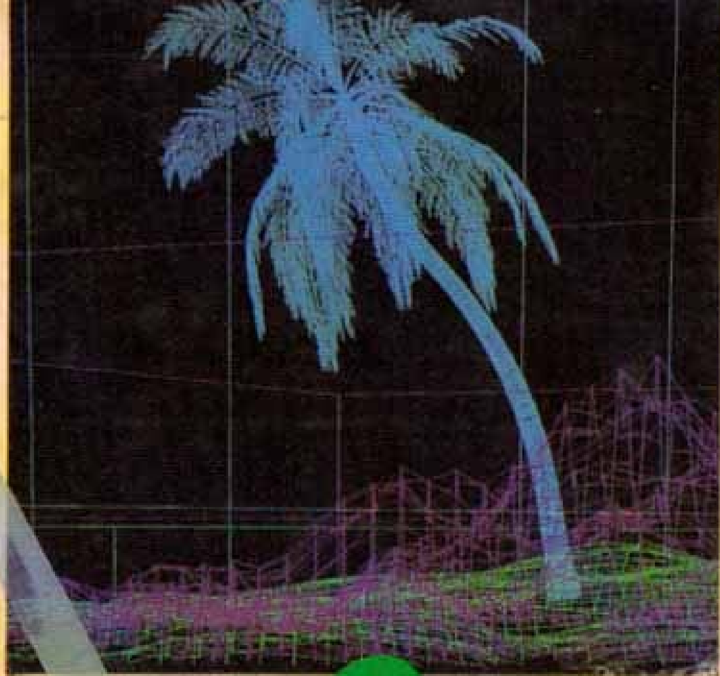


আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ

আবদুল্লাহ আল-মুতী



AJKER BIJNAN O BANGLADESH

[science Today and Bangladesh]

by

Abdullah Al-Muti

সূচিপত্র

বিজ্ঞান মানুষের জন্য

বিজ্ঞান বদলে দিচ্ছে সবকিছু ৯
দিন বছর শতাব্দী পেরিয়ে ১৭
আমরা 'মানুষ' হলাম কবে থেকে ২৭
দেবতারাও হয়তো জানেন না ৩৭

পৃথিবী এগিয়ে চলেছে-

উন্নয়নের গোড়ায় হল উদ্ভাবন ৪৬
তথ্যপ্রযুক্তির মহাসরণি আর কতদূর ৫৬
আগামী শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ৬৪

বিজ্ঞান বাংলাদেশে

স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ৭২
মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখা ৮১
শতাব্দীশেষের পূর্ণগ্রাস ৮৯
একুশ শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতি ৯৫

সবার কাছে নিয়ে যাওয়া

বিজ্ঞানীরা যখন বাঙলায় লেখেন ১০২
বিজ্ঞান নিয়ে লেখা তেমন কঠিন নয় ১১৪
বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান আন্দোলন ১২৪

বিজ্ঞান বদলে দিচ্ছে সবকিছু

এ পৃথিবীতে আমরা কি করে এলাম, মানুষ কি একধাপে এসেছে নাকি ধাপে ধাপে তার উদ্ভব ঘটেছে —— এসব বিষয় নিয়ে গত দেড়শ-দু'শ' বছরে জ্ঞানের বিপুল বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু তা বলে এ বিষয়ে এর মধ্যে সব জিজ্ঞাসার যে নিবৃত্তি ঘটেছে তাও বলা যাবে না। ইতিহাসের ধারা বেয়ে মানুষের জন্মকাহিনীর অনেক রহস্য এর মধ্যে অবারিত হয়েছে, আবার অনেক বিষয় এখনও রয়েছে রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকা।

তবে আজকের দিনে মানুষ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এ অবস্থায় যে সে চিরকাল ছিল না তা নিয়ে আর বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। সেই অতি আদিম নিয়াণ্ডারথাল, ক্রোম্যানিয় বা পিকিন মানব থেকে আজকের দিনের মানুষের মধ্যেকার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ইতিহাসের ধারা এগিয়ে চলেছে, পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে মানুষও। গত বিশ-ত্রিশ লক্ষ বছর ধরে অব্যাহত ধারায় মানুষের বিবর্তন ঘটে চলেছে; মানুষ সমাজবদ্ধ হবার পর সে সমাজও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। দেশে দেশে মানুষের সমাজের যে বিচিত্র রূপ তা আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

'পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, মানুষ বদলে যাচ্ছে' শুধু এটুকু বললেই বুঝি সবটুকু বলা হয় না। বদলে যাবার যে গতি তাও যে একই রকম থাকছে তা নয়। আজ থেকে হাজার বছর আগে পরিবর্তনের যে ধারা ছিল তার চেয়ে একশ' বছর আগে পরিবর্তন ঘটেছে দ্রুততর তালে। আবার একশ' বছর আগের চেয়ে আজ পরিবর্তনের হাওয়া বইছে আরো বেগে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা এক কোটি থেকে বেড়ে দু'কোটি হতে কেটে গিয়েছিল বহু হাজার বছর; অথচ আজ প্রতিবছর পৃথিবীতে যোগ হচ্ছে প্রায় দশ কোটি করে নতুন মানুষ। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে উনিশ শতকের শুরুর দিকে (১৮৩০) একশ' কোটিতে পৌঁছয়; তারপর এই অঙ্ক দু'গুণ হতে অর্থাৎ আরো একশ' কোটি মানুষ যোগ হতে লেগেছিল প্রায় এক শতাব্দী। অথচ তারপর সাত দশক না পেরোতেই সে সংখ্যাও আবার আরো তিনগুণ হয়ে আজ ছ'শ কোটি ছুঁই ছুঁই করছে।

বলা বাহুল্য, গত দু'তিনশ' বছরে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতিই মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় এমন অভূতপূর্ব বেগ সঞ্চার করেছে—মানুষকে অনাগত

দিনে আরো বিপুল বিকাশের পথে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বিজ্ঞানের বিকাশ প্রকৃতির নানা নিয়মকানুন আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে চারপাশের পরিবেশের ওপর মানুষকে অভূতপূর্ব ক্ষমতা দিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা হল বিজ্ঞানের চর্চা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর যুক্তির প্রয়োগের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের, নানা প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার এক নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির হাতিয়ার দিয়েছে। তার ফলে নানা ধরনের কঠিন পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সত্ত্বেও আমরা আগামী দিনে সভ্যতার অব্যাহত অগ্রযাত্রার প্রায় এক নিশ্চিত আশ্বাস পেতে পারি।

দুনিয়াজোড়া পরিবর্তনের ধারায় আজ যে দ্রুততা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার একদিকে যেমন আছে সম্ভাবনার বিশাল খোলা দুয়ার, তেমনি আবার অন্যদিকে আছে সমস্যার বিপুল পাহাড়। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য প্রসারিত করেছে, তার গড় আয়ু বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে, উৎপাদন শক্তির বিপুল বিকাশ ঘটিয়েছে, সারাটা পৃথিবীকে—এমনকি যেন সমগ্র সৌরজগৎকে—এনে দিয়েছে মানুষের হাতের মুঠোয়। সেই সঙ্গে এই বিকাশমান সভ্যতার বিষাক্ত বর্জ্যদ্রব্য সারা পৃথিবীতে বিষবাষ্প ছড়িয়ে যাচ্ছে। নির্বিচারে বনভূমির বিনাশ, জলবায়ুর পরিবর্তন আর দূষণের প্রভাবে অসংখ্য জীব প্রজাতির জন্য অহরহ মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠছে। বলা হয়ে থাকে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতি বছর গড়পড়তা একটি করে প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত পৃথিবীর বুক থেকে; আজ প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে গড়ে একটি প্রজাতি। এখন থেকে সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে জীবকুলের বিলুপ্তির হার দ্রুততর হবে ; অবশেষে তা মানুষের অস্তিত্বের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ইতিবাচক ও নঙর্থক দু'রকম দিকই যে মানুষের সমাজের ওপর, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রভাবের গতিধারা আগামী দিনে কোন্ খাতে বইবে তা স্বভাবতই আমাদের জানতে কৌতূহল জাগে। এসব পরিবর্তন কি হবে নিতান্তই ঘটনাপরম্পরা-নিয়ন্ত্রিত, অথবা তাতে মানুষের অভিপ্রায়-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের প্রতিফলন থাকবে? কোন্ ধরনের জীবনপদ্ধতি, পরিবার আর সমাজ আমাদের কাম্য? বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা সত্যি কি সে সব কামনাকে বাস্তব রূপ দেবার পথে এগোচ্ছে? এসব প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই দেখা দেয়।

সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি

পরিবার আর সমাজের যে রূপ আমরা দেখি তা যে একান্তভাবে মানুষেরই সৃষ্টি তা না বললেও চলে। পৃথিবীর দেশে দেশে এই রূপ হুবহু এক নয় তাও স্পষ্টতই আমাদের চোখে পড়ে। আবার বিভিন্ন দেশে আদিবাসী বা উপজাতীয় মানুষ আর একালের মানুষের মধ্যে এক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। অস্তিত্বের তাগিদে, বংশবিস্তারের প্রয়োজনে, সুস্থ সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্য

অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে মানুষ ধাপে ধাপে তার পরিবার আর সমাজের আজকের কাঠামো গড়ে তুলেছে। ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, বংশগতি— এসব এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে ; আর সেজন্যই দেশে দেশে মানুষের জীবনযাত্রার ধারায় এমন প্রচুর পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এসব নানা পদ্ধতির সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি সেরা তা নিয়ে দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ কম হয় নি। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, এসব সামাজিক কাঠামো কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্যভাবে আজও ক্রমেই নানা দিক দিয়ে বদলে যাচ্ছে। কাজেই পরিবার বা সমাজ কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ আমরা এর মধ্যে পেয়ে গেছি এমন দাবি কোন দেশ বা সমাজই করতে পারে না।

সেই সঙ্গে আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যে রূপ তাও মানুষের বিকাশমান সভ্যতারই সৃষ্টি। মানুষের অপরিসীম কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা, উন্নত জীবনের জন্য তার অপরাজেয় সঙ্কল্প আর সাধনা থেকেই এদের উদ্ভব। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষের জ্ঞানের প্রধান উৎস ছিল পর্যবেক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই মানুষ আগুনের, চাকার, কৃষির, পশুপালনের, সাধারণ হাতিয়ারের ব্যবহার আয়ত্ত করে। জীবনে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হলে অরণ্যচারী যাযাবর মানুষ ক্রমে ক্রমে ঘর বাঁধতে শেখে, থিতু হয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে শুরু করে। স্বভাবতই এই প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে মানুষের পরিবার আর সমাজের রূপ বদলাতে থাকে; জীবনযাত্রার ধারায় পরিবর্তন আসে। এই রূপান্তরের ধারার একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান-নির্ভর প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটে।

একটি যুগের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান, দক্ষতা আর উপলব্ধি সঞ্চয় করে তা তারা সঞ্চারিত করে দিতে চায় তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে। এই প্রয়োজন থেকেই জন্ম নেয় এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা। স্থিত মানুষের সমাজে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্রমে ক্রমে রূপ নেয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যোগ হয় হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা; যুক্তি পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর যুক্তি পদ্ধতি প্রকৃতির নানা নিয়মকানুন উদ্ঘাটনে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে; ঘটে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি চর্চার গোড়াপত্তন।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির চর্চা আবার মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে গুণগত পরিবর্তন আনে। আজ থেকে মোটামুটি আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক সভ্যতার সময়ে বিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছিল বলে ধরা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকাশকালও ধরা হয় তার কাছাকাছি সময় থেকে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনমানে যে ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তার একটি মাত্র নমুনা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। গ্রিক সভ্যতার সময়ে মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল মোটে বিশ বছর ; বিশ শতকের শুরুতে সেটা দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ বছর। অথচ আজ মানুষের গড়পড়তা আয়ু ৭০ বছরের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

গ্রিক সভ্যতার সময় থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির হাতিয়ারকে মানুষ ক্রমেই শাণিত করে তুলছে। গত তিন-চারশ' বছরে এই অগ্রগতির ধারা আরো বিপুলভাবে বিকশিত

হয়েছে। ষোল-সতের শতকে কোপার্নিকাস-কেপলার-গ্যালিলিও ও নিউটন বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের দিগন্তকে আলোকিত করে তুলেছিলেন। আঠার-উনিশ শতকে বস্তুজগতের জ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির জাদুস্পর্শ যুক্ত হয়ে মানুষের জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে ডারউইন-পাস্তুর-মেণ্ডেল জীবজগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের নতুন নতুন পথ খুলে দেন। মানুষের রোগব্যাধির চিকিৎসায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিস্তারে যে অগ্রগতি ঘটে তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য সব দেশের মানুষ তৈরি হবার সুযোগ পায় নি; পরিকল্পনার ধারণা বিকাশ লাভ করতে কিছুটা সময় লাগে। তাই অবশেষে বিশ শতকে এসে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জন্ম দেয়।

বিশ শতকে পৌঁছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরো বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটতে আরম্ভ করে। বেতার যোগাযোগের বিস্তার, অন্তর্দহন ইঞ্জিন আর জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে দূরদূরান্তে যাবার অবারিত সুযোগ, পরমাণুলোকের রহস্য উন্মোচনের ফলে বিস্ময়কর পরমাণুশক্তির আবিষ্কার, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, রকেট প্রযুক্তির সাহায্যে মহাকাশের ওপর মানুষের আধিপত্য—এ সবই সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রায় আমূল নাড়া দিয়েছে। সেই সঙ্গে কৃষি, চিকিৎসাব্যবস্থা ও জৈবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেসব বৈপ্লবিক আবিষ্কার ঘটছে তাও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ওপর বিরাট রকম প্রভাব ফেলছে।

মানুষের পরিবারের ভিত্তিতে রয়েছে পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতা, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবিক অনুভূতি। আবার আমাদের মৌল যেসব বস্তুগত চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বংশরক্ষা— সে সবও পরিবারই মেটাবার ব্যবস্থা করে। এর সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অপ্রতিহত প্রভাব আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগে রোজকার জীবনে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য যেমন বাড়ছে তেমনি আমাদের দৈনন্দিন আচরণও নানাভাবে বদলে যাচ্ছে।

রোজকার জীবন বদলে যাচ্ছে

প্রবীণদের কাছে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যাবে, আহা, আমাদের সময়ে জীবন কত সুখের ছিল! কথাটা হয়তো অনেকাংশে সত্যি। সেকালে পৃথিবীতে মানুষ কম ছিল। যে সব শিশু পৃথিবীর আলোতে প্রথম চোখ মেলত তাদের অধিকাংশ পতঙ্গের মতো আঁতুড়ঘরেই মারা যেত; কাজেই জনসংখ্যা এমন লাগামছাড়াভাবে বাড়বার সুযোগ পেত না। তার ফলে জিনিসপত্রের দাম আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার, সামান্য মাথা গোঁজার ঠাঁই মোটামুটি সহজেই পাওয়া যেত। ভোগ্যপণ্যের বৈচিত্র্য কম ছিল, তবে মানুষের চাহিদাও ছিল সামান্য।

সে সব দিনের তুলনায় আজ জীবন-সংগ্রাম বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশুদের শেখার বিষয় বাড়তে বাড়তে তাদের পুথির বোঝা হয়ে উঠেছে দুর্বহ। বিদ্যালয়ে স্থানাভাব বলে স্কুলের একেবারে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি থেকে সবকিছুই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিযোগিতামূলক। বড় শহরগুলোতে যানবাহনের বাহুল্যে পথচারীদের জন্য চলাচল

হয়ে পড়েছে বিপজ্জনক। একজনের আয়ে আর সংসার চলে না বলে বাড়ির গৃহিণী আজ আর শুধু গৃহিণীমাত্র নন, তাঁকেও নামতে হচ্ছে উপার্জনে। তার ফলে পরিবারে আয়ের হয়তো কিছুটা সাশ্রয় হয়েছে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিকে আগের মতো আর নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে না ; অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর কাজের সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাও হয়ে উঠছে কঠিন।

আগেকার পরিবার ছিল প্রধানত একান্নবর্তী পরিবার। তাতে সচরাচর দু'তিন প্রজন্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করত। এমনি একান্নবর্তী পরিবারে শিশুরা বাবা-মা'র সঙ্গে সঙ্গে দাদা-দাদি বা অন্যান্য গুরুজনের সাহচর্য পেত। তা যেমন শিশুদের সামাজিক শিক্ষায় সহায়ক হত, তেমনি প্রবীণদের সামাজিক গুরুত্বও স্বীকৃতি পেত। আজকের শহুরে পরিবেশে সঙ্কীর্ণ ফ্ল্যাটবাড়িতে স্বামী-স্ত্রী আর একটি দু'টি ছেলেমেয়ের স্থান সঙ্কুলান হওয়াই দুষ্কর, আর কোন ব্যক্তির থাকা হয়ে ওঠে কঠিন। সেই সঙ্গে উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থার কল্যাণে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে এসেছে ; কমে যাচ্ছে জন্মহারও। তার ফলে পরিবারে সন্তানের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ; এক পুরুষ আগেও একটি দম্পতির আট-দশটি সন্তান থাকা ছিল বেশ স্বাভাবিক, আজ সেখানে দু'তিনটির বেশি হলেই বিপদ।

অবশ্য যেমন নতুন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে তেমনি তার মোকাবিলা করার জন্য সংসারের আয়োজনেও পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে শহুরে বাড়িতে রান্নাঘরের ব্যবস্থায়। আগে বাড়ির রান্নাঘরটি ছিল সাধারণত ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন কালিঝুলিময় একটি এলাকা। আজ শহরের বাড়িতে অল্প জায়গার মধ্যে একটি পরিপাটি রান্নাঘরের উদ্ভব ঘটছে। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরে বিশেষত যেখানে গৃহিণী নিজেও উপার্জন করেন সেখানে কোথাও কোথাও রেফ্রিজিরেটার, প্রেসার কুকার, 'আভেন' ইত্যাদি সরঞ্জাম রান্নার ঝামেলা কমাতে সহায়তা করছে। তাছাড়া এক প্রজন্ম আগেও সব খাবার বাড়িতে তৈরি করা ছাড়া মধ্যবিত্তের আহার পরিবেশনের আর কোন বিকল্প ছিল না। আজ শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে চাইনিজ বা আর কোন বাইরের তৈরি খাবার গ্রহণের বা তৈরি খাবার বাড়িতে নিয়ে এসে খাবার প্রবণতা বাড়ছে।

এমনিভাবে টেলিফোন, টেলিভিশন, ভি.সি.আর.—উন্নত দেশে সেই সঙ্গে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া— ইত্যাদিও শহুরে দৈনন্দিন জীবনে বিরাটভাবে প্রভাব ফেলছে। শহর আর গ্রামের পার্থক্য ক্রমেই কমে আসছে; বাংলাদেশেও গ্রামে গ্রামে বিজলি যাচ্ছে। উন্নত দেশগুলিতে তিন-চতুর্থাংশ লোকই বাস করছে শহরে; বাংলাদেশেও এই হার যেখানে শতাব্দীর শুরুতে ছিল মাত্র জনসংখ্যার দু'শতাংশ সেখানে আজ দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশে পৌঁছেছে।

বংশরক্ষা ও বিজ্ঞান

পরিবার যে কতটা বদলে যাচ্ছে তা বংশরক্ষার ব্যাপারে স্পষ্ট বোঝা যায়। বংশরক্ষা আর সন্তান লালন যে-কোন সমাজেই পরিবারের একটা প্রধান দায়িত্ব। আজ

জন্মশাসনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আবিষ্কৃত হবার ফলে পরিবারের আকার নিয়ন্ত্রণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। বহু হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে এই বিশ শতকে এসেই মানুষ প্রথম প্রজননের ওপর এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে। শিশুমৃত্যু রোধ, উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা আর ব্যাধি নিরাময় ব্যবস্থার সঙ্গে প্রজনন নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এক বৈপ্লবিক মাত্রা যোগ করেছে। দুনিয়ার দেশে দেশে আগের তুলনায় শিশু আজ কম জন্মাচ্ছে। কিন্তু যারা জন্মাচ্ছে তাদের অধিকাংশের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল, সুষম পুষ্টিকর খাদ্য, উন্নত বাসস্থান আর শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আয়োজন আজ সম্ভব। আর এজন্যই দুনিয়াজোড়া গড় জীবনকালের প্রত্যাশা মাত্র গত এক শতাব্দীর মধ্যেই প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রজননের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে আরো নানা বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। তার ফলে আগে যেসব দম্পতির সন্তান লাভের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না, তারা যেমন সন্তান লাভ করতে পারছে, তেমনি দম্পতির ইচ্ছা অনুযায়ী বিশেষ বাঞ্ছিত সন্তান—যেমন কন্যা বা পুত্র লাভও সম্ভব হয়ে উঠেছে। অবশ্য কিছু কিছু নতুন ধরনের প্রযুক্তি, যেমন মাতৃগর্ভের বাইরে গর্ভকোষের নিষেক বা নিষিক্ত সন্তান মায়ের জরায়ু ছাড়া অন্য নারীর জরায়ুতে ধারণ— নতুন নতুন নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। এধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার যদি ব্যাপক হয়ে ওঠে তখন যে সব নতুন সমস্যা দেখা দেবে তার সমাধানের জন্য সম্ভবত আগামীতে নতুন পারিবারিক আইনগত কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে।

পরিবারের ভিত্তি হিসেবে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ এমনি যেসব প্রপঞ্চ এতকাল মানুষের ধরাছোঁয়া বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অতীত বলে গণ্য হত সে সব এলাকাও আজ আর বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের বাইরে নয়; এসব অনুভূতির বস্তুগত বা রাসায়নিক ভিত্তি তাঁদের পরীক্ষার আওতায় এসেছে। কিন্তু তার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত আচরণে বা পরিবারের কাঠামোতে কি কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটবে? যদি বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের ভিত্তিতে তেমন কিছু ঘটে তবে তা হয়তো পরিবারের জন্য কল্যাণই বয়ে আনবে। মনোগত বা বুদ্ধিগত বিকাশ সম্পর্কে গত একশ' বছরে মানুষের জ্ঞানের যে বিকাশ ঘটেছে তা আজ দেশে দেশে শিশু শিক্ষার ওপর প্রভাব ফেলছে; শিশুদের জন্য উন্নততর শিক্ষাগত পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে, শিশুর মেধা ও মননের সর্বোত্তম বিকাশ যাতে নিশ্চিত হয় সেরকম ব্যবস্থা করা যাচ্ছে।

জন্মশাসন আর উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কল্যাণে পরিবার কাঠামোয় যেসব পরিবর্তন ঘটছে তার মধ্যে একটি বড় ঘটনা হল বয়স-কাঠামোর ভারসাম্য বদলে যাওয়া। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের হার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি; অথচ উন্নত দেশগুলিতে শিশুদের হার মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়েও কম। অন্যদিকে বাংলাদেশে ষাট বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্কদের সংখ্যা

মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (মাত্র পাঁচ শতাংশ); অথচ উন্নত দেশগুলিতে এ ধরনের প্রৌঢ় ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার বিশ শতাংশের মতো। তাই সে সব দেশে প্রবীণদের জন্য রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। জনসংখ্যায় প্রবীণদের হার সারা দুনিয়াতেই বাড়ছে। কাজেই জীবন মানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও প্রবীণদের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। 'কুড়িতেই বুড়ি' বলে এদেশে এককালে যে ধারণা ছিল তা আজ অচল হয়ে উঠছে; তবে আগামী দিনের সমাজে ক্রমবর্ধমান প্রৌঢ় জনসংখ্যার সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা রক্ষা এবং তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা সমাজের একটা বড় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে।

এমনি আরেক পরিবর্তন ঘটছে নগরায়ন বাড়বার ফলে। এককালে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বাস করত গ্রামে । প্রধানত শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নগরমুখী যাত্রা শুরু হয়। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে উন্নত দেশগুলোতে নগরবাসীর সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি বেশি। আজ অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার উল্টো; উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট নগরবাসীর সংখ্যা হয়ে উঠেছে উন্নত দেশগুলোর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। দু'হাজার সাল আসতে আসতে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক বাস করবে নগরে; আর সেই নগরবাসী তিনশ' কোটি লোকের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই হবে উন্নয়নশীল দেশে। এসব উন্নয়নশীল দেশে যারা নগরে বাস করে তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেককে বাস করতে হয় ঘিঞ্জি বস্তিতে। স্বভাবতই বস্তির ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষের সুস্থ দৈহিক ও মানসিক বিকাশের কিছু নতুন ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটছে।

বস্তুগত জীবনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি যেসব পরিবর্তনের সূচনা করেছে তার চেয়ে মনোজগতে যে রূপান্তর ঘটছে তার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। এককালে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানকে বেশি কাম্য বলে গণ্য করা হত। আজ বিজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার তত্ত্ব তুলে ধরেছে। উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা আর শিক্ষা বিস্তারের ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে মেয়েরাও পুরুষের মতোই সমান অবদান রাখতে পারে। আমাদের দেশেও নানা পেশায় নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। এতে পরিবারের কাঠামো বদলে যাচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক সমাজ।

গণতান্ত্রিক সমাজ ও বিজ্ঞান

আগামী দিনের গণতান্ত্রিক সমাজ হবে মূলত সব মানুষের সমানাধিকার ও মেধাভিত্তিক সমাজ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ছিল অনেকাংশে পুরুষের পেশিশক্তির ওপর নির্ভরশীল। এই পেশিশক্তি শিকারি সমাজে, এমন কি কৃষিভিত্তিক সমাজেও ছিল খুবই প্রয়োজনীয়, কাজেই অতি কাম্য। পেশিশক্তির জোরে অনেক ক্ষেত্রে

পুরুষ এমন সব আইনকানুন তৈরি করেছিল যা পুরুষের প্রাধান্যকে সব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে। নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ যেহেতু হবে মূলত মেধাভিত্তিক সমাজ, কাজেই সেখানে পুরুষের এই পেশিভিত্তিক প্রাধান্যের অবসান ঘটবে।

আসলে গণতান্ত্রিক সমাজকে বৈজ্ঞানিক সমাজ থেকে পৃথক করে দেখা শক্ত। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতিই মানুষে মানুষে সমানাধিকারের দার্শনিক তত্ত্বকে তার বস্তুগত ভিত্তি দিয়েছে। এই বিশ শতকে পৌঁছে উৎপাদন ব্যবস্থার এমন ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে যে, মানুষের পক্ষে বিপুল পরিমাণ খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠেছে। তার ফলে ইতিহাসে এই প্রথম সারা পৃথিবীর সব মানুষের জীবনযাত্রার মানকে একটা সুষম পর্যায়ে তোলার সম্ভাবনা আজ আর নিতান্ত অলীক কল্পনাবিলাস বলে বিবেচনা করা যায় না। এই সমানাধিকার যেমন পৃথিবীর দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, তেমনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, গ্রাম-নগর নির্বিশেষে অর্জন আজ সম্ভব হয়ে উঠেছে।

শুধু নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দিকটিকে বিবেচনা করলেও বলতে হবে ইতিহাসে এই প্রথম নারীসমাজের মেধা ও শ্রমের সর্বোচ্চ বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের এক বিপুল অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে সচরাচর পুরুষদের তুলনায় নারীদের অধিকার সীমাবদ্ধ, তুলনামূলকভাবে তাদের শিক্ষার হারও কম। বাংলাদেশে কিছুদিন আগেও এই হার ছিল পুরুষদের তুলনায় প্রায় অর্ধেক; সম্প্রতি নারী শিক্ষার বিকাশের ফলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো এতকাল সমগ্র জনসমাজের এবং বিশেষ করে নারীদের সৃজনশীলতাকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে দুনিয়ার অন্যান্য অগ্রসর দেশের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। আজ নারী-পুরুষের সমানাধিকারের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাতে নারীরা গৃহকোণের সীমাবদ্ধ অঙ্গন থেকে মানব সভ্যতার বিস্তৃত অঙ্গনে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে তাদের মেধা ও সৃষ্টিশীল অবদানে সমগ্র সমাজই লাভবান হচ্ছে।

সমাজের এই বৃহৎ অঙ্গনে নারীদের সমান অংশগ্রহণের ফলে স্বভাবতই পরিবারের চিরায়ত কাঠামো বা রীতিনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেবে; তার ফলে পরিবারের ভারসাম্যে হয়তো কিছু কিছু টানাপোড়েনেরও সৃষ্টি হবে। কিন্তু সমাজ রূপান্তরের অমোঘ ধারায় এধরনের পরিবর্তনকে একেবারে ঠেকিয়ে রাখা হবে দুঃসাধ্য। এসব পরিবর্তনকে যতটা সম্ভব সহনীয় করে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত আগামী দিনের পরিবার কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সবার খাইয়ে নেবার কোন বিকল্প নেই।

সব মিলিয়ে আগামী দিনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আজ নানা অভাবিত বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। আগামী দিনে যে সব অগ্রগতি ঘটবে তা মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে যে আরো বিপুলভাবে অবারিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিজীবন, পরিবার জীবন আর সামাজিক জীবনও নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়ে নতুন নতুন সম্ভাবনায় বিকশিত হয়ে উঠবে।

দিন বছর শতাব্দী পেরিয়ে

দিন পেরিয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ পেরিয়ে মাস আসে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন আর কাজের মজুরির হিসেবের জন্য কালের এই আবর্তন আমাদের জীবনে বিশেষ অর্থ বয়ে আনে। চাষবাসের ধারাও পালটায় ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু একটা বছর পেরিয়ে যখন আরেকটা এসে হাজির হয় তখন সারা দেশে আর সমাজে একসঙ্গে বড় রকম ঢেউ ওঠে। বছরের ক্রান্তিলগ্নে চারপাশের প্রকৃতিতে, বিশ্ব চরাচরে যেন দোলা লাগে। মানুষ নতুন বছরের আবাহন করে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে।

সপ্তাহ পেরিয়ে যায় মাত্র সাত দিনে; মাস পেরোয় চার সপ্তাহে বা মোটামুটি ত্রিশ দিনে। বার মাসে কাটে বছর। কিন্তু যখন এমনি একশ'টা বছর ক্রমে ক্রমে ঝরে যায় কালের গর্ভে, একটা শতাব্দী খসে পড়ে ইতিহাসের পাতা থেকে, তখন সারা সমাজে অর্থনীতিতে যে সাড়া জাগে তার তুলনা মেলা ভার। শতাব্দী পেরোতে একশ' বছর কেটে যায় বলেই যে শুধু তা এমন আলোড়ন তোলে তা নয়। একটা শতাব্দীর ইতি ঘটা যেন ইতিহাসের একটা অধ্যায় পেরিয়ে যাওয়া। কোন মানুষের জীবনে পরপর দু'টি শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্ন দেখা সাধারণত হয়ে ওঠে না। এমন যদি কখনো কারো বেলায় ঘটে তাহলে সেটাকে বলতে হয় অতি বড় ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু এ সময়ে আমাদের অনেকের জন্যই দুটো পঞ্জিকার হিসেবে শতাব্দীর পালাবদল দেখার এক বিরল সৌভাগ্য ঘটতে চলেছে।

কিছুদিন আগেই এসে হাজির হয়েছিল বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর ক্রান্তিকাল; চতুর্দশ শতক পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম পঞ্চদশ শতকে। তখন বাংলাদেশ আর পশ্চিম বাংলা দু'জায়গাতেই এ নিয়ে উৎসব হয়েছিল— যদিও হিসেবের কিছু হেরফেরে পশ্চিম বাংলায় ১৪০০ সালকে নতুন শতাব্দীর শুরু ধরে উৎসব হয়েছে; বাংলাদেশে ১৪০১ সালকে ধরা হয়েছে নতুন শতাব্দীর শুরু বলে। আবার আর কিছুদিনের মধ্যেই আধুনিক পাশ্চাত্য পঞ্জিকার হিসেব মতো বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে আরম্ভ হবে নতুন একবিংশ শতাব্দী।

এক হিসেবে দেখলে গত শতাব্দী— সে বাংলা চতুর্দশ শতাব্দী অথবা পশ্চিমী বিংশ শতাব্দী যেটাই ধরা হোক— ছিল বাঙালিদের জন্য এক ঐতিহাসিক বিজয়ের শতাব্দী। এ শতাব্দীর শুরু হয়েছিল আমাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জগতে এক বিশাল জাগরণের মধ্য দিয়ে। আর শতাব্দীর শেষ দিকে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অর্জন

হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতার উত্তরণ এদেশের মানুষের জন্য নির্ভেজাল আনন্দের হয় নি। স্বাধীনতার পরের সময় কাটছে বিপুল সমস্যার পাহাড় কেটে; দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, সন্ত্রাস, স্বৈরাচার এখনও মানুষের জীবনে কালো থাবা বিস্তার করে আছে। তবু সান্ত্বনার এই যে, এদেশের মানুষ পরাজয় মানে না, আশায় বুক বেঁধে নিরন্তর লড়াই করে চলে আগামী দিনের নতুন জীবনের জন্য।

কিন্তু এই যে সময়ের প্রবাহ—এ মানুষের জন্য এক চিরকালের ধাঁধা। সময় কি আছে অনন্তকাল ধরে আর চলবে অনন্তকাল? কেমন করে মাপা যায় সময়কে? কখন শুরু হয়েছিল বছর আর শতাব্দী গণার হিসেব, কি করে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময়ের মাপকাঠি আমাদের আজকের সন গণনায় পৌঁছল?

আমাদের কাছে স্থানের মতো কালকেও এক পরম সত্তা বলে মনে হয়। স্থানকে ধরাছোঁয়া যায়; তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ আছে। সময়কে ধরাছোঁয়া যায় না; কিন্তু তার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আছে। সময় যেন অনেকটা নদীর প্রবাহের মতো; অতীত থেকে এসে বর্তমান কাল পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে। সময় একবার পেরিয়ে গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার জন্য, সময়কে কাজে লাগাবার জন্য মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা নিয়তই আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান।

সাধারণভাবে মনে হবে স্থান-কাল দুই-ই মহাবিশ্বের শুরু থেকে ছিল আর তার শেষতক থাকবে, এর ব্যতিক্রম অন্য কিছু ভাবাও হয়ে ওঠে কষ্টকর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, সময়ের ধারণা মানুষের বরাবরই আজকের মতো ছিল না; আর সময়ের অস্তিত্ব যে অনন্তকালের তাও নয়। এমন কি বলা হচ্ছে, বিশ্বে বস্তু আছে বলেই সময় আছে; বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, যেমন কৃষ্ণবিবরে— সময় উধাও হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সময়ের প্রকৃতির একেবারে গোড়া ধরে টান দিচ্ছে আজকের বিজ্ঞান।

চাঁদ-সূর্য থেকে মাস-বছর

আজ আমরা জানি, সৌরজগতের আরো আটটি গ্রহের মতো পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে; আবার দিন-রাতে পৃথিবী একবার ঘোরে তার নিজের অক্ষের ওপর। সূর্যের চারপাশে এক পাক ঘুরে আসতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাই হল এক বছর। এই সহজ সত্যের ওপর ভিত্তি করে আজকের প্রায় সব ধরনের বছর, মাস, সপ্তাহ গণার হিসেব গড়ে উঠেছে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘুরপাক খাবার সহজ সত্যটি বুঝতে মানুষের অনেক সময় লেগেছিল। মানুষের উদ্ভব ঘটেছে সম্ভবত ত্রিশ লক্ষ বছর আগে; কৃষি সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে সেও প্রায় দশ হাজার বছরের কাছাকাছি। কিন্তু পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার ব্যাপারটা মানুষ বুঝতে বা মেনে নিতে পেরেছে চারশ' বছরও হয় নি।

সূর্য পরিক্রমার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), তাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), কেপলার (১৫৭১-

১৬৩০) প্রমুখ বিজ্ঞানীর অসামান্য অবদান রয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করার 'অপরাধে' গ্যালিলিওকে সেকালের মহাপরাক্রমশালী ধর্মযাজকদের হাতে যে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল তা আজ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগে রোমের পোপ অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছেন যে, ধর্মীয় আদালতে গ্যালিলিওকে শাস্তি দেয়া তাঁর পূর্বসুরিদের একটা মহা ভুল হয়েছিল।

পৃথিবী যে সূর্যের চারপাশে ঘোরে এ ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও কৃষিকাজের প্রয়োজনে এক ধরনের ঋতু গণনা আর বর্ষপঞ্জির হিসেব প্রাচীন ব্যাবিলনীয় আর মিসরীয়রা উদ্ভাবন করেছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই। এ হিসেব তারা করেছিল আকাশে তারার জগতে বছরের বিভিন্ন সময়ে যে সব পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে তারাদের মধ্য দিয়ে সূর্যের চলার পথের আপাত সম্পর্ক লক্ষ্য করে। দেখা গেল তারার জগতে সূর্য সারা বছর চলাচল করে একটা সীমাবদ্ধ পথ ধরে। এই সীমানার মধ্যে সূর্য ক্রমে ক্রমে উত্তরে সরে গিয়ে যখন প্রান্তসীমায় পৌঁছায় সে অবস্থার নাম দেয় তারা 'উত্তরণ'। তারপর সূর্য দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে যখন সর্বদক্ষিণে পৌঁছায় তখন সেটাকে বলা হল 'দক্ষিণায়ন'। আজকের হিসেবে উত্তরায়ণ হয় ২১ জুন আর দক্ষিণায়ন ২২ ডিসেম্বর— এই দুটি দিন উত্তর গোলার্ধে যথাক্রমে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ছোট দিন।

উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়নে যাবার পথ সূর্য এক সময় বিষুবরেখা অতিক্রম করে (শরৎ-বিষুবণ); এদিন সারা পৃথিবীতে দিন-রাত সমান হয়। আজকের হিসেবে এ দিনটি ২৩ সেপ্টেম্বর। আবার দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে যাবার পথেও সূর্য একদিন বিষুবরেখা অতিক্রম করে (বসন্ত-বিষুবণ); সেদিনও দিন-রাত সমান হয়। আজকের হিসেবে দিনটি ২১ মার্চ। এক উত্তরায়ণ থেকে আরেক উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন থেকে দক্ষিণায়ন পর্যন্ত সময়কে ধরা হল এক বছর।

এই যে চারটি দিন নির্দিষ্ট করা গেল এ দিয়ে সারা বছরকে ভাগ করা যায় মোটামুটি চারটি ঋতুতে। উত্তরায়ণ থেকে শরৎ-বিষুবণ পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল; শরৎ-বিষুবণ থেকে দক্ষিণায়ন শরৎকাল; দক্ষিণায়ন থেকে বসন্ত-বিষুবণ শীতকাল; বসন্ত-বিষুবণ থেকে উত্তরায়ণ পর্যন্ত বসন্তকাল। আমাদের দেশে চাষাবাসের সময়ের সঙ্গে মিল রেখে ঋতু ধরা হল ছ'টা— গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

মধ্যপ্রাচ্যে তাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিস নদীর মাঝামাঝি এলাকায় গড়ে উঠেছিল সুমের আর ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। তারা ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে মিল রেখে ৩৬০ দিনে বছর ধরে। তারা এও লক্ষ্য করে যে, মোটামুটি ২৯.৫ দিনে চাঁদের কলা কমে-বাড়ে। তাই ৩০ দিনে মাস ধরে বছরকে আবার ভাগ করা হল বার মাসে। এই মাসের হিসেব কাজে লাগল ধর্মকর্মে। ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল বছরে দিনের মোট সংখ্যা ৩৬০ নয়, ৩৬৫; কিন্তু তাদের পুরোহিতদের কাছে যে-কোনো কারণেই হোক ৩৬০ সংখ্যাটা মনে হত একটা জাদুর সংখ্যা। তাই বৃত্তের ডিগ্রির সংখ্যাও ধরা হয়েছিল ৩৬০।

চাঁদের মাস দিয়ে বছরের হিসেব ধরলে চাষবাসের কাজে তেমন সুবিধে হয় না।

চাঁদের বার মাস হয় মোটামুটি ৩৫৪ দিনে; অথচ সূর্যের হিসেবে বছর হয় মোটামুটি ৩৬৫ দিনে; অর্থাৎ দুটো বছরের হিসেবের মধ্যে প্রায় ১১ দিনের গরমিল থাকে। তাই ক্রমে ক্রমে সৌর মাস গণনার হিসেব তৈরি করতে হল। সৌর বছরের হিসেবকে চাঁদের কলার মতো বার মাসে ভাগ করতে হলে আকাশে তারাদের মধ্যে সূর্যের যে আপাত চলার পথ তাকে সমান বারটা ভাগ করতে হবে।

তারার রাজ্যে বার মাসের সীমানা ঠিক করা মোটেই সহজ কাজ নয়। প্রাচীনকালের লোকেরা তারাদের কাল্পনিক জোট ধরে আকাশে নানা তারামণ্ডলের ছবি কল্পনা করেছিল। তারপর এই ছবিগুলোকে বার ভাগ করে তাদের একেকটি ভাগকে বলা হল রাশি বা চিহ্ন। এসব রাশির নাম দেয়া হল মেষ, বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু, মকর ইত্যাদি। আমাদের বাংলা মাসের হিসেবগুলো করা হয় এই রাশিচক্রের ভিত্তিতে। পৃথিবী থেকে দেখলে সূর্য যেদিন মেষরাশিতে ঢোকে বলে মনে হয় সেদিন থেকে শুরু হয় বোশেখ মাস। যেদিন সূর্য মেষ রাশির এলাকা ছেড়ে ঢোকে বৃষ রাশিতে সেদিন থেকে শুরু জ্যৈষ্ঠ মাস; এমনি করে চলে চৈত্র মাস পর্যন্ত।

বাংলা মাসের নামগুলোও এসেছে সেই রাশির কোন তারার নামে। বোশেখ মাসে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যায় মেষরাশির বিশাখা নক্ষত্রে; তাই এ মাসের নাম বৈশাখ। জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার চাঁদ থাকে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। এভাবে পরপর অন্যান্য মাসে চাঁদ থাকে আষাঢ়া, শ্রবণা, ভাদ্রপাদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, ফাল্গুনী আর চিত্রা নক্ষত্রে। এসব নক্ষত্রের নাম থেকেই মাসের নাম হয়েছে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন আর চৈত্র।

হিসেবের গরমিল মেটানো

মনে রাখতে হবে এসব হিসেব আর নামকরণ সবই হচ্ছিল আধুনিক বিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিদ্যা সৃষ্টির অনেক আগে; আর এর প্রায় সবটাই হয়েছিল প্রাচ্যের নানা দেশে। আজ যে আমরা দিন-রাতকে ২৪ ঘন্টায় ভাগ করি এর উৎপত্তি প্রাচীন মিসরে। প্রথমদিকে তারা ব্যাবিলনীয়দের মতো বছরের বারটা মাসই ধরত ৩০ দিনের। কিন্তু তাতে মাসের হিসেবের সঙ্গে ঋতুর হিসেবে গরমিল হতে লাগল; চাষবাসে ঘটল অসুবিধে। এই গোলমাল মেটাবার জন্য তারা বছরের হিসেবের মধ্যে অতিরিক্ত আরো পাঁচটা দিন যোগ করতে শুরু করল; তাতে বছর হল ৩৬৫ দিনের। মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নীল নদের ধারে; তাদের চাষবাসের জন্য নীলনদের প্লাবন ছিল যেন দেবতাদের আশীর্বাদ। তাদের মাসের হিসেব ঠিকই থাকল; বার মাসের পর বাড়তি ৫ দিন ধরা হল নীল নদের প্লাবনের জন্য উৎসবের সময় হিসেবে। এই পাঁচটা দিন কাটত তাদের হই-হল্লা আর ফুর্তিতে।

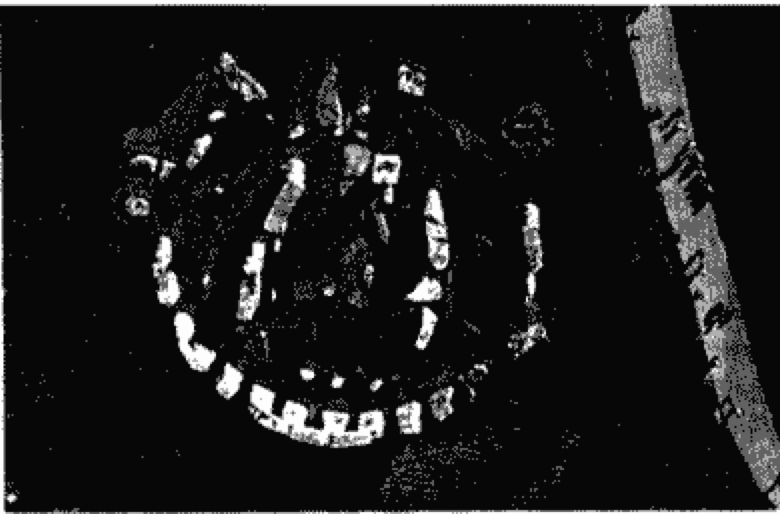
৩৬৫ দিনে বছর ধরেও হিসেবের গোলমাল মেটানো গেল না। বহুদিন পর বোঝা গেল আসলে সৌর বছর হয় মোটামুটি ৩৬৫.২৫ দিনে। এই গোলমাল শোধরানোর জন্য আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে রোমক সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রতি চার বছরে পঞ্জিকায় একদিন যোগ করে 'লিপ ইয়ার' বা 'অধিবর্ষ' গোনার ব্যবস্থা করলেন।

ষোড়শ শতকে কোপার্নিকাস, তাইকো ব্রাহে প্রমুখ আধুনিক জ্যোতির্বিদের আবির্ভাব ঘটল। তাঁরা সূর্য আর গ্রহ-নক্ষত্রের চলাপথের সূক্ষ্ম হিসেব বের করতে আরম্ভ করলেন। দেখা গেল সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘোরার সময় আসলে পুরোপুরি ৩৬৫.২৫ দিনও নয়, তার চেয়ে সামান্য কম অর্থাৎ ৩৬৫.২৪২২ দিন (৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড)। চার বছরে একদিন 'অধিবর্ষ' ধরলে প্রতি বছর ০.০০৭৮ দিন অর্থাৎ ১১ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড বেশি ধরা হচ্ছে; তার ফলে প্রতি ৪০০ বছরে তিন দিন বেশি হয়ে যাচ্ছে। ১৫৮২ সালে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি এই ত্রুটি শোধরাবার জন্য নিয়ম করলেন শতাব্দীর বেলায় সালের অঙ্ককে যদি ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তবেই শুধু সে বছর অধিবর্ষ ধরা হবে, তা নইলে নয়। গ্রেগরির তৈরি এই বর্ষপঞ্জির নিয়মে ১৬০০ সালকে অধিবর্ষ ধরা হয়েছে, কিন্তু ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ সালকে ধরা হয় নি; এরপর ২০০০ সালকে আবার অধিবর্ষ ধরা হবে।

চান্দ্র বছর আর সৌর বছরের মধ্যে যে হিসেবের গরমিল তা বাংলা সনের ব্যাপারে প্রথমদিকে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। আরব আর মধ্যপ্রাচ্যে ঋতুর বৈচিত্র্য আমাদের দেশের চেয়ে অনেক কম। তাই সেসব দেশে চান্দ্র মাসের হিসেবে ততটা অসুবিধে হয় নি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য উমরের খেলাফতের সময় হিজরি সন প্রবর্তন করা হয়; যে বছর হিজরত ঘটেছিল সে বছরের পয়লা মহরম (১৬ জুলাই ৬২২ খ্রিঃ) থেকে হিজরি সনের শুরু ধরা হল। এই হিজরি সন চলে চান্দ্র মাসের নিয়মে।

ভারতে শক সম্রাট কনিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। সেই থেকে চালু হয়েছিল সৌর নিয়মে শকাব্দের হিসেব। তারপর খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের তুর্কি, আফগান, মোগল বিজেতারা যখন ভারতে আসতে শুরু করলেন তখন তাঁরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এলেন হিজরি সন গণনার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা তাঁরা এদেশেও চালু করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই যে চান্দ্র বছর আর সৌর বছরের মধ্যে ১১ দিনের গরমিল, সেটা ৩৩ বছরে পুরো এক বছরের গরমিল হয়ে দাঁড়ায়। এতে ঋতুর সঙ্গে তাল মেলে না বলে ফসল বোনা বা তোলা, খাজনা আদায় এসব ব্যাপারে নানা অসুবিধে হতে লাগল। তাতে দেশের শাসন কাজে ঘটতে লাগল বিশৃঙ্খলা।

এই অসুবিধে দূর করার জন্য সম্রাট আকবর তাঁর সভাসদ পণ্ডিত ফতেউল্লাহ শিরাজির পরামর্শ চাইলেন। শিরাজি তাঁকে পরামর্শ দিলেন হিজরি সনের হিসেব পালটে ফেলে সৌর নিয়মে ফসলি সন নামে এক নতুন বর্ষপঞ্জি চালু করার। আকবরের সিংহাসনে বসবার দিন (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিঃ বা ২ রবিয়স্ সানি ৯৬৩ হিঃ) থেকে এই সন গণনার হিসেব ধরা হল। বাংলাদেশে এই ফসলি সন চালু হল 'বঙ্গাব্দ' হিসেবে। তবে সেটা কার্যত ঐ তারিখ থেকে শুরু হল না। তার আগে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজত্বের সময় বাংলাদেশে সৌর নিয়মের শকাব্দ চালু হয়েছিল। এই শকাব্দ শুরু হত মধ্য-এপ্রিলে ১লা বৈশাখ থেকে। তাই ১৫৫৬ সালের



● বিলেতের দক্ষিণ প্রান্তে স্টোনহেঞ্জ-এ বিশাল সব পাথরের খণ্ড সাজানো আছে। মনে হয় এককালে কৃষকরা এসব পাথরের ছায়া থেকে ঋতু পরিবর্তনের হদিস পেত আর এখানে তাদের পুজো দিত। তিন হাজার বছরের পুরনো এই কাঠামোটি স্পষ্টতই একটি অতি প্রাচীন মানমন্দির।



● পৃথিবী যে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এটা পোল্যান্ডের পাদ্রী নিকোলাস কোপার্নিকাস ১৫৪৩ সালে প্রকাশ করেন তাঁর De revolutionibus (ঘূর্ণনের বিষয়ে) বইতে; আর এ বই বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণায় আমূল পরিবর্তন আনে।



● কোপার্নিকাসের *De revolutionibus* বইতে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আরবদের গবেষণার উল্লেখ আছে। তিনি সম্ভবত দশম শতকের ইরানি জ্যোতির্বিদ আবদুর রহমান আস-সুফী-র স্থির নক্ষত্রদের বিবরণ বইটি পড়েছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে ঐ বইয়ের একটি কপির কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলের চিত্র। চিত্রকর সমরকন্দবাসী একজন ইরানি, কর্ণা আকৃতি আঁকায়; ছবিতে চীনা আর পোশাকে মোঙ্গল ছাপ স্পষ্ট।

মধ্য-এপ্রিলে ১ বৈশাখ ৯৬৩ বঙ্গাব্দ ধরে নতুন সন গণনা চালু হল। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ আর ৯৬৩ বঙ্গাব্দের মধ্যে তফাত ঘটল ৫৯৩ বছরের। সেই একই তফাত রইল ১৪০১ বঙ্গাব্দ আর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

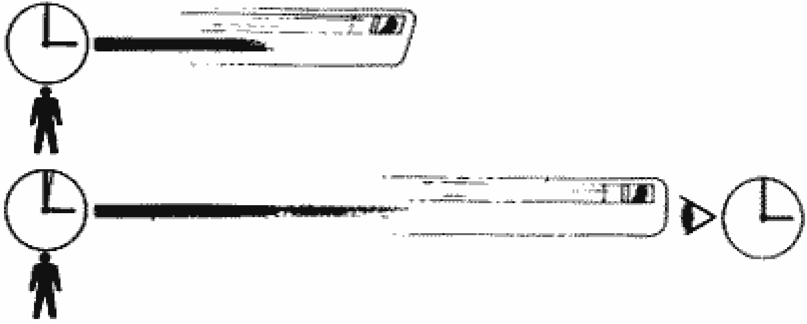
সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণ বা বঙ্গাব্দ চালু হবার পর থেকে দেখতে দেখতে ৪৪০ বছর কেটে গিয়েছে; অর্থাৎ আমরা পেরিয়ে এসেছি চারটি শতাব্দী। কিন্তু বঙ্গাব্দের শুরুর পর এই প্রথম আমরা একটা শতাব্দী পেরিয়ে আরেক শতাব্দীতে পৌঁছেছি একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে। ইংরেজি একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখিও হচ্ছি আমরা এক স্বাধীন জাতি হিসেবে। আগামী শতাব্দীতে আমরা কি হতে চাই আর কি হতে পারি— তার অনেকটাই নির্ভর করবে আমাদের নিজেদেরই ওপরে।

সময় তবু আজো রহস্যময়

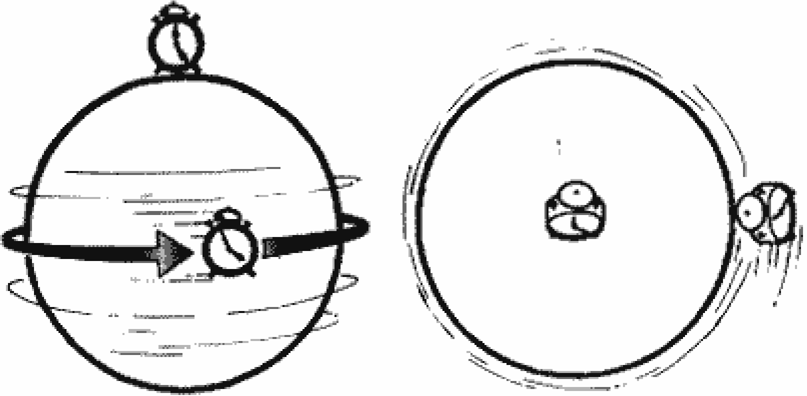
স্বাধীন দেশের মানুষ হিসেবে এদেশের মানুষ যেমন আজ নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তেমনি মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে প্রকৃতির নানা গভীর রহস্যের সন্ধান নিয়েও। আর এমনি প্রশ্ন তুলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সময়ের মতো একটা অতি সাধারণ বিষয় যা নিয়ে মানুষের নিত্যদিনের কাজকর্ম তার প্রকৃতি বোঝাও আসলে তেমন সহজ নয়।

সতের শতকে নিউটনের মতো মহাবিজ্ঞানীও আমাদের চেনা-জানা পৃথিবীতে আমরা সাধারণভাবে যেমন দেখি সময়কে অনেকটা সেভাবেই দেখেছিলেন— একটা নিরন্তর প্রবহমান অন্য-নিরপেক্ষ পরম সত্তা হিসেবে। আর এই ভিত্তিতেই তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর গতির নিয়মকানুনের বিখ্যাত সূত্রগুলো। কিন্তু বিশ শতকে আইনস্টাইন এসে বদলে ফেললেন সে ধারণা। ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে তিনি বললেন সময় কোন পরম সত্তা নয়, স্থানের মতো সেও আপেক্ষিক; তার মাপ নির্ভর করে স্থান আর পর্যবেক্ষকের বেগের ওপর। তার দু'বছর পর হারম্যান মিনকৌস্কি নামে এক গণিতবিদ উদ্ভাবন করলেন এক নতুন জ্যামিতি; তাতে স্থানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ এই তিন মাত্রার সঙ্গে যোগ হল কালের এক চতুর্থ মাত্রা। এই নতুন জ্যামিতিতে স্থান-কাল-ব্যাপ্তির প্রকৃতি বোঝা কিছুটা সহজ হয়ে উঠল।

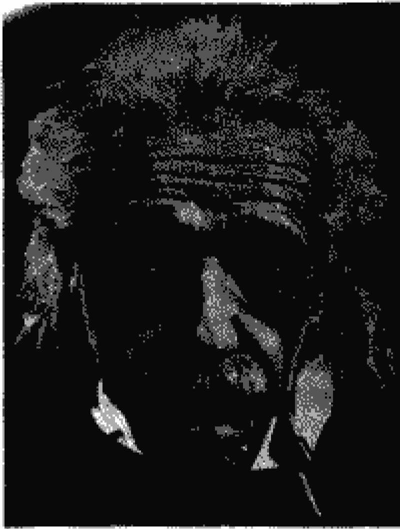
অবশ্য আইনস্টাইনের এ তত্ত্ব আমাদের চেনা-জানা পৃথিবীর সাধারণ সব ব্যাপারে তেমন কোন তারতম্য ঘটায় না; সময়ের মাপে দৃষ্টিগ্রাহ্য তারতম্য ঘটে যখন কোন বস্তুর বেগ হয়ে দাঁড়ায় প্রচণ্ড— যেমন ঘটে পদার্থবিজ্ঞানীদের আধুনিক কণাত্বরক যন্ত্রে। এধরনের যন্ত্রে পারমাণবিক কণার বেগ হয়ে উঠতে পারে আলোর বেগের কাছাকাছি। সে অবস্থায় আইনস্টাইনের নিয়ম না মানলেই বরং পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়ে ওঠে অসম্ভব। আর এ অবস্থায় যেটুকু সময়ের হেরফের হয় তার পরিমাপও সাধারণ মাপার যন্ত্রে হবে একবারে অবাস্তব। তাই এসব হিসেবের জন্য নিখুঁতভাবে সময়ের হিসেব করা আজ হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি



আইনস্টাইন ছেলেবেলায় একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন; আমি যদি একটা আলোর কণায় চড়ে বসি তাহলে সব কিছু কেমন দেখাবে?—এ প্রশ্নের জবাব তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ১৯০৫ সালে তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বে। ধরা যাক বেলা ঠিক তিনটায় আইনস্টাইন একটা ট্রামে চড়ে রওনা হলেন আলোর বেগে (সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার), তারপর পৌঁছলেন তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরে পরের স্টেশনে। এটুকু পথ যেতে তাঁর লাগছে ঠিক এক সেকেণ্ড সময়। কিন্তু দ্বিতীয় স্টেশনে দাঁড়িয়ে কেউ যদি প্রথম স্টেশনের ঘড়িটা দেখে তাহলে সেখানে সে সময় দেখবে ঠিক তিনটা, কেননা তার কাছে আলো পৌঁছতেও কেটে যাচ্ছে এক সেকেণ্ড। অথচ প্রথম স্টেশনে দাঁড়ানো কোন দর্শক সময় দেখবে তিনটা বেজে এক সেকেণ্ড। তাহলে নিউটন সময়কে যে একটা পরম সত্তা বলে ধরেছিলেন তা আর খাটছে না; অর্থাৎ ঘড়ির সময় নির্ভর করছে দর্শক আর তার বেগের ওপর।



আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একটা সিদ্ধান্ত হল চলন্ত ঘড়ির তুলনায় স্থির ঘড়ি দ্রুত চলবে। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন বলেছিলেন: "হুবহু একই রকম দুটো ঘড়ি যদি বসানো যায় পৃথিবীর কোন মেরুবিন্দুতে আর বিষুবরেখার ওপর তাহলে বিষুবরেখায় বসানো ঘড়িটি সামান্য একটু ধীরে চলবে।" এই ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য ইংরেজ বিজ্ঞানী এইচ. জে. হে একটা মডেল তৈরি করলেন। তিনি মনে মনে পৃথিবীকে ওপর নিচে চেপ্টে দিয়ে একটা গ্রামোফোনের চাকতির মতো করে ফেললেন। এই চাকতির কেন্দ্র যেন পৃথিবীর মেরুবিন্দু আর কিনারাটা বিষুবরেখা। এবার এমনি এক চাকতির কেন্দ্রে আর কিনারে দুটো পারমাণবিক ঘড়ি বসিয়ে চাকতিটাকে তিনি ঘোরাতে শুরু করলেন। দেখা গেল আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত এখানে ঠিকই কাজ করছে। এর মানে দাঁড়ায় আমাদের সব রেকর্ড-প্লেয়ারের ডিস্ক-এ কিনারার তুলনায় মাঝখানের বয়স বাড়ছে বেশি— সে যত সামান্য মাত্রায়ই হোক।



অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)

জরুরি।

আমাদের সাধারণ যে সব যান্ত্রিক ঘড়ি তা যত উঁচু মানেরই হোক তাতে দিনে অন্তত এক সেকেণ্ড সময়ের হেরফের হবেই এটা ধরে নেয়া যেতে পারে। সত্তরের দশক থেকে কোয়ার্জ (স্ফটিক) কেলাসের ঘড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। এসব ঘড়িতে কোয়ার্জ কেলাসের নিখুঁত মাত্রার বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে (প্রতি সেকেণ্ডে ৩২,৭৬৮ বার) কাজে লাগিয়ে সময় মাপা হয়। তার ফলে অতি দামি যান্ত্রিক ঘড়ি যত ভাল সময় দিতে পারে তার চেয়ে একটা সস্তা দামের কোয়ার্জ ঘড়িও বেশি নিখুঁত সময় দেয়।

সমুদ্রে যে সব জাহাজ চলে বা আকাশে যে সব বিমান ওড়ে তার সঠিক অবস্থান নিখুঁতভাবে জানার জন্য সময়ের শুদ্ধতা মাইক্রোসেকেণ্ড (এক সেকেণ্ডের নিযুত ভাগের এক ভাগ) মাপের হলেই চলে; কিন্তু মহাকাশে ধাবমান নভোযানের নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়ের শুদ্ধতা দরকার ন্যানোসেকেণ্ড (এক সেকেণ্ডের ১০০ কোটি ভাগের একভাগ) মাপের। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানীদের দরকার পিকোসেকেণ্ড (ন্যানোসেকেণ্ডের হাজার ভাগের একভাগ) বা তারও কম সময়ের হিসেব। এ ধরনের মাপের শুদ্ধতা পাওয়া যায় সিজিয়াম ধাতুর উপাদান দিয়ে তৈরি পারমাণবিক ঘড়িতে। সিজিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রনের স্পন্দনের হার প্রতি সেকেণ্ডে ৯১৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৭০ বার। এমনি পরমাণু-ঘড়িতে সময়ের হেরফের হতে পারে দিনে মাত্র দু'এক ন্যানোসেকেণ্ড। এত শুদ্ধভাবে সময় মাপার ফলেই সময়ের প্রকৃতি জানার জন্য আজ এমন সব পরীক্ষা করা যাচ্ছে যা আগে আদৌ সম্ভব ছিল না।

আইনস্টাইনের বিশেষ তত্ত্বে বলা হয়েছে কোন ঘড়ির বেগ বাড়লে সেটা কিছুটা ধীরে চলবে। এটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ১৯৭১ সালে চারটে জেট বিমানকে পাঠানো হল পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসার জন্য। প্রথমে তারা উড়ল পুব দিক দিয়ে, তারপর পশ্চিম দিক দিয়ে। পৃথিবী তার অক্ষের ওপর দিনরাত ঘুরছে পশ্চিম থেকে পুব দিকে; তাই পুবে ছোটা বিমান পশ্চিমে ছোটা বিমানের চেয়ে হবে দ্রুততর। তাই তত্ত্ব অনুসারে সে ঘড়ি পিছিয়ে পড়ার কথা ৩১৫ ন্যানোসেকেণ্ড; বাস্তবে সময়ের তারতম্য পাওয়া গেল ৩৩২ ন্যানোসেকেণ্ড। যে-কোন পরীক্ষার অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ দিলে এটা তত্ত্বের সঙ্গে বেশ ভালই মিলেছে বলতে হবে। ঘড়ির বেগ যদি অনেক বেড়ে ওঠে তাহলে সময়ের হেরফের ঘটবে অনেক বেশি। কোন নভোযান যদি আলোর বেগের ৮৭ শতাংশ বেগে চলে তাহলে তাতে ঘড়ির বেগ দাঁড়াবে পৃথিবীর

ওপরকার ঘড়ির তুলনায় অর্ধেক।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে স্থান-কাল সবই হল আপেক্ষিক; এ বিশ্বে পরম আর অনড় হল শুধু আলোর বেগ। বিশাল কোন বস্তু তার চারপাশে স্থানকে দেয় বাঁকিয়ে; তাই সেখানে আলোকে ছুটতে হয় বেশি লম্বা পথ, ফলে ঘড়ি চলে ধীরে। বৃহস্পতি হল সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ; পৃথিবীর তুলনায় তার ভর প্রায় ৩১৮ গুণ। কাজেই কোন পরমাণু-ঘড়িকে যদি বৃহস্পতির ওপর নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে সেটা পৃথিবীর ওপরকার চেয়ে কম সময় দেখাবে। অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ যেমন স্থানকে বদলে দেয় তেমনি বদলে দেয় সময়কেও।

আজ বিজ্ঞানীরা মহাকাশে চুপসে যাওয়া কিছু অসাধারণ ভারি নক্ষত্রের হদিস পাচ্ছেন; তাদের বলা হচ্ছে কৃষ্ণবিবর। তাতে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি এমন প্রচণ্ড যে, সে আকর্ষণের বাঁধন কাটিয়ে কোন কিছুই বাইরে বেরোতে পারে না, এমন কি আলোও নয়; তাই কৃষ্ণবিবর থাকে আমাদের দৃষ্টির বাইরে। আর এই কৃষ্ণবিবর তার প্রবল আকর্ষণের টানে চারপাশের সবকিছুকেই নিজের ভেতর গিলে ফেলে; শুধু বস্তু নয়, এমন কি কাছাকাছি স্থান আর সময়ও সেখানে অদৃশ্য হয়ে যায়। আরেকভাবে দেখলে সময় হল শুধু দুটো ঘটনার মধ্যেকার আগে-পিছের হিসেব। কৃষ্ণবিবরে কোন ঘটনা নেই, তাই সেখানে সময়ের অস্তিত্বও নেই।

এসব তো হল তত্ত্বের কথা। আমাদের অভিজ্ঞতার ভেতর যে সময় তার তো হেরফের ঘটবার কোন লক্ষণ আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না। তবে সময়ের ধারা অনড় থাকবার কোন ভরসাও বিজ্ঞানীরা দিতে পারছেন না। ভূবিজ্ঞানীদের হিসেব মতো আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর নিজের অক্ষের ওপর ঘোরার বেগ ছিল এখনকার চেয়ে বেশি— তখন দিন-রাত ঘটত মাত্র ২০ ঘণ্টায়। আবার আজ থেকে বিশ কোটি বছর পর পৃথিবীতে দিন-রাত হবে ২৪ ঘণ্টায় নয়, ২৫ ঘণ্টায়। অর্থাৎ আমাদের ধরাছোঁয়ার সময়েও ঘটে যাবে অনেকখানি হেরফের।

ভাগ্যিস বিশ কোটি বছর পেরিয়ে যেতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি আছে; তাই তখনকার মানুষ কিভাবে ২৫ ঘণ্টার দিন-রাতকে কাজে লাগাবে সে ভাবনা ভেবে আমাদের ঘুম নষ্ট করার সময় এখনও হয় নি।

আমরা 'মানুষ' হলাম কবে থেকে

এ পৃথিবীতে আজ আমরা যা কিছু দেখি তার কিছুটা প্রাকৃতিক নিয়মে কয়েক'শ' কোটি বছর ধরে তৈরি হয়েছে; আবার পৃথিবীর অনেকটাই তৈরি হয়েছে মানুষের হাতে। দিন দিন মানুষের সংখ্যা আর ক্ষমতা যত বাড়ছে এ পৃথিবীতে তার হাতের ছাপ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সে ছাপের ভাল-মন্দ দুটো দিকই তত বেশি করে আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে। —কিন্তু কবে থেকে মানুষ এসেছে এ পৃথিবীতে? কিংবা আরো একটু স্পষ্ট করে বললে : কবে থেকে মানুষ সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠেছে?

এই কথা ক'টি যাঁরা পড়ছেন তাঁদের কারো কারো মনে হয়তো এমন একটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে: মানুষ কি আজো সত্যিকার অর্থে 'মানুষ' হয়ে উঠতে পেরেছে? অথবা পৃথিবীতে আজ মানুষ নামের যত প্রাণী বাস করে তাদের সবাই কি পেরেছে মানুষ হতে? যদি পারত তাহলে আমাদের চারপাশে এত হানাহানি, এমন মিথ্যাচার, দুর্বলের ওপর সবলের এমন শোষণ আর অত্যাচার হয়তো থাকত না। তবে এধরনের দার্শনিক আর নৈতিক প্রশ্ন আপাতত থাক; সাদামাটা অর্থে আজ যাদের আমরা মানুষ বলে চিনি তাদের 'মানুষ' হিসেবে মেনে নিয়ে এ প্রশ্নের হদিস খোঁজা যেতে পারে : ঠিক কখন মানুষ এলো এ পৃথিবীতে?

এরপর অবশ্য আমাদের আরেকটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। সে হল মানুষ তাহলে আমরা কাদের বলব। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল্ (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) থেকে শুরু করে ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭-৭৮), চার্লস্ ডারউইন (১৮০৯-৮২) প্রমুখ পূর্বসুরিরা প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগের যেসব নিয়মকানুন শিখিয়েছেন তাই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। যেমন লিনিয়াস শিখিয়েছিলেন যে-সব উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক প্রজনন ঘটে তারা হল একই প্রজাতি (species)। যেসব প্রজাতির মধ্যে আকার-প্রকারে বেশ মিল দেখা যায় তাদের একসঙ্গে করে বলা যায় 'গণ' (genus)। তাঁর নিয়মে প্রজাতির নামকরণ হয় দু'শব্দে—প্রথম শব্দে বোঝায় এটা কোন্ গণ-এর, দ্বিতীয় শব্দে বোঝায় কোন্ প্রজাতি। যেমন মানুষের কাছাকাছি যেসব প্রাণী তাদের ফেলা হল Homo (নামটা লিনিয়াস দিয়েছিলেন ১৭৫৮ সালে তাঁর Systema Naturae' নামে বইতে) বা নর নামে একটা গণ-এ; তার মধ্যে আছে বেশ ক'টি প্রজাতি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রজাতি হল আজকের মানুষ; এর নাম দেয়া হল Homo sapiens (অর্থাৎ জ্ঞানী নর)।

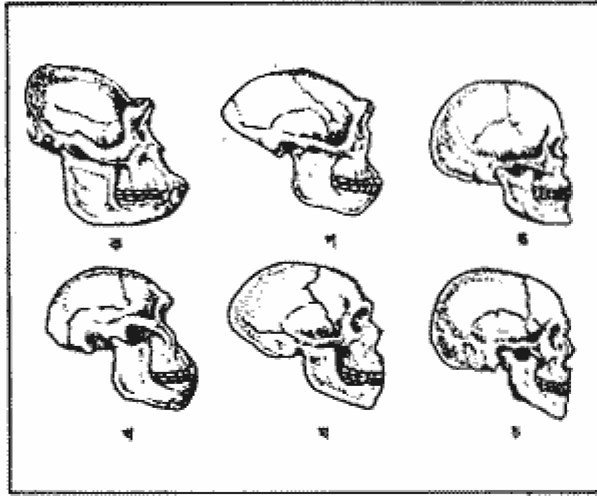
আমরা বহুকাল থেকে শুনে আসছি মানুষ হল সৃষ্টির সেরা জীব ; হুবহু এমন জীব

পৃথিবীতে আর আসে নি। কিন্তু অন্যান্য জীব থেকে মানুষের প্রভেদ ঠিক কোন্ গুণের জন্য? কেউ বলবেন সে বিশেষ গুণ হল তার সোজা হয়ে দাঁড়ানো; কেউ বলবেন তার মগজের আয়তন বা ধারালো বুদ্ধি; কেউ বলবেন তার হাতিয়ার তৈরি আর ব্যবহার করার ক্ষমতা। তবে এটা তো ঠিক যে, মানুষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তার নিজের সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে জানার এক অদম্য কৌতূহল। সেই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "খোকা মাকে শুধায় ডেকে এলেম আমি কোথা থেকে..." এ শুধু শিশুদের নয়, যেন সব বয়সের মানুষের সেই চিরকালের কৌতূহলেরই প্রতিধ্বনি।

মানুষের ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা ঘটেছিল ১৮৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে, ডুসেলডর্ফের কাছে নিয়াণ্ডারথাল (অর্থাৎ নিয়াণ্ডার উপত্যকা) নামে এক জায়গায় চুনাপাথর খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গেল একটা অদ্ভুত ধরনের মাথার খুলি আর কিছু হাড়গোড়। সেই খনির খোদকরা তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবে নি যে, এসব হাড়গোড় নিয়ে একদিন সারা পৃথিবীতে তোলপাড় সৃষ্টি হবে। তারপর এমনি আরো কঙ্কাল পাওয়া গেল পুবে বিলেত থেকে পশ্চিমে উজবেকিস্তান আর দক্ষিণে ইজরায়েল পর্যন্ত নানা এলাকায়। তখনও পর্যন্ত ডারউইনের 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রকাশিত হয় নি। উইলিয়াম কিং নামে এক আইরিশ ভূতত্ত্ববিদ পরীক্ষা করে বললেন এগুলো এক বিশেষ ধরনের বিলুপ্ত জাতের মানুষের কঙ্কাল; এরা পৃথিবীতে বাস করত দু'লক্ষ বছর থেকে ২৭,০০০ বছর আগে পর্যন্ত। কিন্তু এরা কি আজ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে নাকি পৃথিবীর কোথাও কিছু কিছু আদিবাসীদের মধ্যে তাদের অবশেষ রয়ে গিয়েছে সে প্রশ্নের এখনও কোন মীমাংসা হয় নি। এরা কি জ্ঞানী নরেরই একটা বিশেষ ধারা, না কি মানুষের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ধারা তা নিয়েও এখনো ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে মানুষের আদি ইতিহাস নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান চলছেই আর তার আদি জন্মকাল কেবল যেন পিছিয়েই চলেছে।

ফসিল থেকে জন্মতারিখ

গত দেড়শ' বছরে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর নানা জায়গায় মাটি খুঁড়ে মানুষজাতীয় অনেক বিলুপ্ত প্রাণীর হাড়গোড় আবিষ্কার করেছেন। মাটির নিচে ফসিলের নিশানা থেকে জানা যায় পুরনো দিনের অনেক কথা। হাড়গোড়ের সঙ্গে পাওয়া যায় মানুষের ব্যবহার করা জিনিসপত্রের নমুনা : তাদের তৈরি হাতিয়ার— পাথর, ব্রোঞ্জ বা লোহার তৈরি বর্শা, বল্লম, ছুরি। এধরনের পুরনো দিনের জিনিসের নমুনাকে বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মানুষের অস্থি-কঙ্কালের বয়স জানা যায় রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব এমনি সব বিজ্ঞানের সাহায্যে। যেমন হাড়ের বয়স জানা যায় রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে আর কার্বন-১৪ উপাদানের তেজস্ক্রিয়তা মেপে। পঞ্চাশ হাজার বছরের বেশি পুরনো ফসিলের বয়স জানতে ব্যবহার করা হয় পটাসিয়াম-আর্গন তেজস্ক্রিয়া মাপার পদ্ধতি। হাড়ের গড়ন আর আকার থেকেও বোঝা যায় সে প্রাণীর বয়স; উরুর হাড়ের মাপ থেকে বোঝা যায় দেহের উচ্চতা। অস্থির লক্ষণ থেকে বোঝা যায় পেশির গড়ন; শ্রোণিচক্র থেকে বোঝা যায় কঙ্কালটি



মগজের বিকাশ: এপ (ক) -এর মগজের আয়তন ৪৫০ ঘন সে.মি; অস্ট্রালোপিথেকাস (খ)-এর ৪৫০-৬৫০ ঘন সে.মি.; পিথেকানথ্রোপাস (গ)-এর ৯০০ ঘন সে.মি.; ক্রোম্যানিয় (ঘ)-এর ১,৪০০-১,৬০০ ঘন সে.মি.

পুরুষ না নারীর। দাঁত থেকে বোঝা যায় মানুষটি উদ্ভিদভোজী না মাংসভোজী। দাঁতের আকার আর আকৃতি থেকে মানুষটির বিকাশের স্তর জানা যায়।

এধরনের নানা গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে মানুষকে আজ আমরা যে চেহারায় দেখি চিরকাল তার রূপ হুবহু এরকম ছিল না ; ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে তার আদল অনেক বদলেছে ; চেহারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধিরও অনেক বিকাশ ঘটেছে। এসব আদিম মানুষদের কাউকে বলা হচ্ছে নিয়াণ্ডারথাল, কাউকে ক্রোম্যানিয়, কাউকে-বা পিকিন মানব। বিজ্ঞানীদের এসব গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি গত প্রায় পাঁচ কোটি বছর ধরে এক অব্যাহত ধারায় বিবর্তনের ফসল হিসেবে পৃথিবীর মানুষের আজকের এ অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যে বিশাল শ্রেণী তার মধ্যে আছে প্রাইমেট নামে একটা বর্গ ; মানুষ ছাড়াও তাতে আছে এপ বা অবমানব, বানর, লেমুর এসব প্রাণী। অন্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্রাইমেটদের মগজের আয়তন বড়। এদের হাতের বুড়ো আঙুল এমন বিশেষ ধরনের যে, সে আঙুল বাঁকিয়ে অন্য সব আঙুলের ডগা ছোঁয়া যায় ; তাতে কোন কিছু আঁকড়ে ধরতে সুবিধে হয়। এদের দৃষ্টিশক্তিতেও আছে কিছু বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে প্রাইমেটদের উদ্ভব প্রায় সাত কোটি বছর আগে ; তারপর প্রায় তিন কোটি বছর ধরে নানা ধরনের প্রাইমেটের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। প্রাইমেটদের মধ্যে মানুষের খুব কাছাকাছি হল গরিলা, ওরাং ওটাং, শিম্পাঞ্জি এসব। এক সময় এপ আর মানুষের পূর্বসুরিদের ধারা ভাগ হয়ে গিয়ে তাদের পৃথক পরিবার সৃষ্টি হয়েছে।

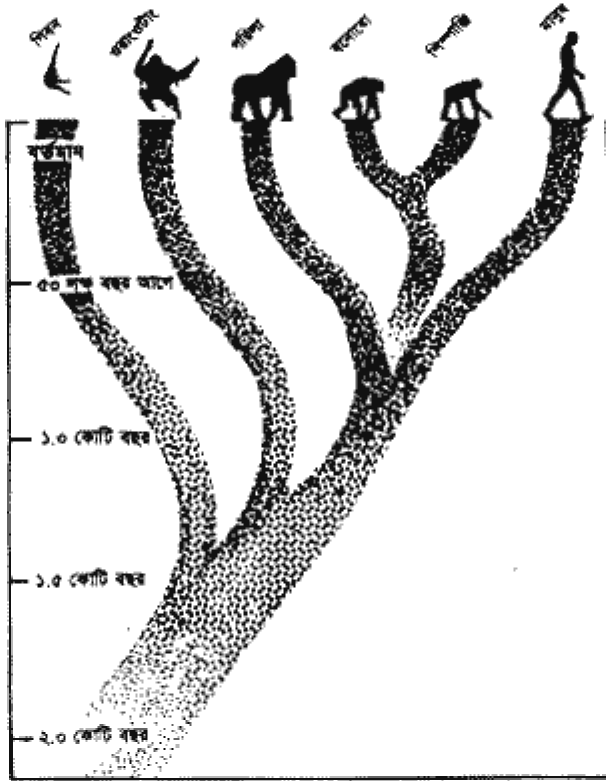
সম্ভবত প্রায় তিন কোটি বছরের ক্রমবিকাশের ধারায় কিছু এপ গাছ থেকে মাটিতে নেমে এসে সোজা হয়ে হাঁটতে চেষ্টা করে। জীবন ধারণের জন্য খেতে শুরু করে গাছের মূল, কন্দ এসব। এভাবে তাদের হাত আর পায়ের বুড়ো আঙুলের বিশেষ ব্যবহার শুরু হয়েছে। সম্ভবত দেড় থেকে দু'কোটি বছর আগে হোমিনিড বা আদি মানব পরিবারের যাত্রা শুরু। এপ বা অবমানব থেকে পৃথক হয়ে এই আদি মানব সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে ; তাকিয়েছে দূরে সামনের দিকে— যেন দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কোন জিনিস দেখতে পারে। সম্ভবত ৮০ লক্ষ থেকে এক কোটি বছর আগে এরা দু'পায়ে হেঁটে চলতে আরম্ভ করে। এসব চেষ্টার মধ্য দিয়ে তাদের মগজের আয়তন বেড়েছে ; জাত হিসেবে তাদের নাম দেয়া হয়েছে হোমো।

হোমোদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা প্রজাতি; বেশির ভাগের নিবাস আফ্রিকায়, কিছু এশিয়াতেও। তাদের মধ্যে এক প্রজাতি হোমো হাবিলিস, আরেক প্রজাতি হোমো ইরেক্টাস। হোমো ইরেক্টাস মানে হল খাড়া মানুষ। এদের কিছু ফসিলের হদিস পাওয়া যায় আফ্রিকায়, কিছু ইন্দোনেশিয়া, চীন এসব দেশে। এদেরই কারো কারো পরিণত রূপ হল *Homo sapiens* (হোমো স্যাপিয়েন্স) বা জ্ঞানী নর— যাদের বলা চলে আধুনিক মানুষ।

এই শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত সাধারণভাবে মনে করা হত প্রায় দু'কোটি বছর আগে এপ নামে প্রাইমেটদের থেকে একটি ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একটা অংশ কালে কালে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে, বুদ্ধিবৃত্তিতে বিকশিত হয় ; তাদেরই বলা যায় *Homo sapiens*। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মানুষের বিকাশ একেবারে সরলরৈখিক ধারায় ঘটে নি। বিভিন্ন স্তরে দেখা দিয়েছে নানা ধারা, তাদের মধ্যে কোন কোনটি হয়তো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে বা হারিয়ে গিয়েছে, কারো মধ্যে অপেক্ষাকৃত দ্রুত দৈহিক বা মানসিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আর এসব নানা স্তরের সবকিছু যে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাও নয়, অনেক স্তরে ফসিল বা জীবাশ্মই এখনও পাওয়া যায় নি। কেউ বলছেন, এপদের থেকে মানুষের ধারাটি পৃথক হয়েছে প্রায় দু'কোটি বছর আগে, আবার কেউ অন্য প্রমাণ থেকে বলছেন, আসলে শিম্পাঞ্জি আর মানুষের ডি.এন.এ.-র মধ্যে মিল প্রায় ৯৯ শতাংশ ; তাতে মনে হয় এরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়েছে বেশি হলে ৪৫ লক্ষ বছর আগে।

এপ আর মানুষ

হোমিনিডি (মানুষের মতো দেখতে প্রাণী) নামে বড়সড় পরিবারের অন্তর্গত হল এপ বা অবমানব। এপ বানর নয় আবার পুরো মানুষও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি তার স্থান। মিশরের ফাইউম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে তিন কোটি বছর আগেকার আদি অবমানবের ফসিল। এধরনের ফসিল আবিষ্কারের সময় লণ্ডন চিড়িয়াখানায় কনসাল নামের একটি শিম্পাঞ্জি বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ প্রিয় ছিল ; শিম্পাঞ্জিদের পূর্বরূপ এই অর্থে সেই ফসিলটির নাম দেয়া হল প্রোকনসাল। ১৯৪৮ সালে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ লুইস লীকি-র স্ত্রী মেরি লীকি প্রোকনসালের একটি পূর্ণাঙ্গ মাথার খুলি আবিষ্কার

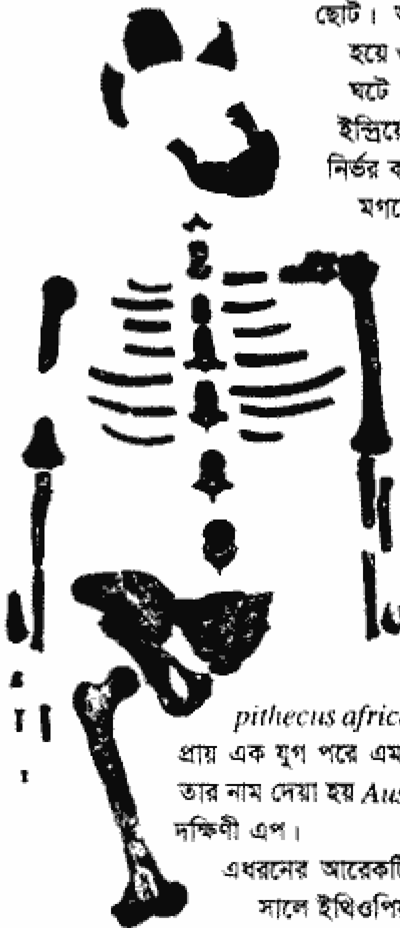


নানা জাতের প্রাইমেটের বিকাশের কালক্রমিক ধারা

করেন। খুলিটি পাওয়া গিয়েছিল আফ্রিকার ভিকটোরিয়া হ্রদের একটি দ্বীপে ; এটি ছিল আড়াই কোটি বছরের পুরনো। এমনি অবমানবের নমুনা পাওয়া গিয়েছে আরো নানা জায়গায়।

এপ আর মানুষের কিছু প্রধান দেহগত মিল-অমিলের কথা এখানে মনে করা যেতে পারে। মিল হল লেজ না থাকা; কোন কিছু আঁকড়ে ধরার উপযোগী বিশেষ ধরনের বুড়ো আঙুল ; আর তাদের বক্ষপঞ্জরের বিশেষ ধরনের কাঠামো। এসব থেকে এমন এক সাধারণ পূর্বপুরুষের কথা মনে হয় যারা গাছের ডালে ডালে ঝুলত। এপদের মধ্যে গিবন আর ওরাং ওটাংদের দেখা যায় গাছের ডালে ডালে ঝুলে মগডালের ডাঁসা আর পাকা ফলগুলো পেড়ে নিতে। অন্যদিকে মানুষ সোজা হাঁটে দু'পায়ে ভর করে। শিম্পাঞ্জি আর গরিলারাও আধো-খাড়া একটা ভঙ্গিতে হাঁটতে পারে। তবে তাদের গা ঘন লোমে ঢাকা, আমাদের গা প্রায় লোমহীন। আমাদের শুধু হাতের বুড়ো আঙুল কোন কিছু আঁকড়ে ধরার উপযোগী; তাদের পায়ের বুড়ো আঙুলও এমনি ধরনের। তাছাড়া এপদের মগজের আকার মানুষের তুলনায় বেশ

ছোট। আমাদের পূর্বপুরুষদের পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠার পথে যেসব প্রধান শারীরিক পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে রয়েছে দু'পায়ে হাঁটা আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘ্রাণের চেয়ে দেখার ওপর বেশি নির্ভর করা। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মগজের আকার ক্রমে ক্রমে বড় হয়েছে।



প্রাইমেটদের মধ্যে একেবারে শুরুতে যারা দু'পায়ে ভর দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিল সম্ভবত তারা উঁচুতে ছিল মোটামুটি এক মিটার; তাদের দাঁত ছিল মানুষের মতো, তবে মগজের আকার ছিল মাত্র ৪০০-৫০০ ঘন সে.মি.। এরকম একটি প্রাণীর ফসিল প্রথম খুঁজে পান রেমণ্ড ডার্ট নামে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ ১৯২৪ সালে; এটি ছিল পাঁচ-ছ' বছর বয়সী এক শিশুর মাথার খুলি। তিনি এর নাম রাখলেন *Australo-pithecus africanus* অর্থাৎ 'আফ্রিকার দক্ষিণী এপ'। এর প্রায় এক যুগ পরে এমনি আরেকটা বড়সড় ফসিল পাওয়া যায়: তার নাম দেয়া হয় *Australo-pithecus robusta* অর্থাৎ বলিষ্ঠ দক্ষিণী এপ।

এধরনের আরেকটি নারীদেহের ফসিল পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ার আফার এলাকায়; এর ডাক নাম রাখা হয় লুসি, আর বৈজ্ঞানিক নাম *Australo-pithecus afarensis* অর্থাৎ আফার এলাকার দক্ষিণী এপ। এর মাথার খুলির বেশির ভাগ সহ শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ খুঁজে পাওয়া যায় নি; কিন্তু যেটুকু পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় লুসির উচ্চতা ছিল মাত্র ১.০৭ মিটার অর্থাৎ সাড়ে তিন ফুট আর ওজন ৩০ কেজির মতো। তবে এত খাটো হলে কি হবে এর হাঁটুর জোড় থেকে বোঝা যায় এটি হাঁটত একেবারে খাড়া হয়ে। অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষরা খাড়া হয়ে হাঁটতে শুরু করেছে আজ থেকে অন্তত চল্লিশ লক্ষ বছর আগে।

● *'আদি মানবী' লুসির প্রায় ৩২ লক্ষ বছরের পুরনো কঙ্কালের অবশিষ্ট*

এধরনের প্রাণীর বেশ কিছু পায়ের ছাপ আর কঙ্কালের নমুনা ইথিওপিয়ার হাদার অঞ্চলেও পাওয়া গিয়েছে। এদের হাড়ের গড়ন থেকে বোঝা যায় এজাতের

প্রাণীরা যত না মাটিতে দু'পায়ে হাঁটত তার চেয়ে গাছে গাছেই চলাচল করত বেশি ; আর এদের পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে আকারে অনেকখানি তারতম্য ছিল। পুরুষরা লম্বায় হত প্রায় ১.৫ মিটার, আর ওজনে মোটামুটি ৫০ কেজি। এরা দেখতে ছিল প্রায় অন্যান্য অবমানবের মতোই তবে বাস করত ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ বছর আগে। কেউ কেউ মনে করেন লুসি হল সবচেয়ে পুরনো মানবীর ফসিল; বলা চলে এরা এপ আর মানুষের মধ্যেকার যোগসূত্র। হয়তো এধরনের হোমিনিড থেকেই পরের আর সব জাতের মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল।

এসব নমুনা থেকে মনে হয় আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম দিকে প্রধানত গাছে বাস করত, তবে মাঝে মাঝে মাটিতে নেমে এসে হাঁটত সোজা হয়ে। এরকম আচরণের নমুনা দেখা যায় আজকের বনোবো নামের বেঁটে আকারের শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে। অবশ্য এসব অস্ট্রেলোপিথেকাসের মগজ ছিল মানুষের চেয়ে অতিমাত্রায় ছোট। তাদের চেয়ে অনেকটা বড়সড় মগজওয়ালা আরো উন্নত জাতের *Homo habilis* বা দক্ষ মানব সে সময়ে দেখা দিয়েছিল এর কাছাকাছি এলাকাতেই— আজ থেকে ২০-২৫ লক্ষ বছর আগে।

১৯৬০ সালে তানজানিয়ার অল্ডুভাই গিরিখাতে লুইস ও মেরি লীকি দম্পতি এধরনের দক্ষ মানবের সন্ধান পেলেন। অনুমান যে, এরা শিকারে অভ্যস্ত ছিল। এদের প্রধান খাদ্য ছিল মাছ-মাংস, গাছের মূল ও কন্দ। চলাফেরা করত দু'পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মতো। এদের মগজের আয়তন ছিল প্রায় ৭০০ ঘন সে.মি. আর এরাই প্রথম হাতিয়ার বানাতে শুরু করেছিল (তা থেকেই এদের নামকরণ)। এদের গড়পড়তা উচ্চতা ছিল ১.৫২ মিটার বা পাঁচ ফুটের কাছাকাছি ; ওজন ছিল বড়জোর ৪৫ কেজি। এত কম ওজনের প্রাণী যে সেকালের বড় বড় হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে শিকারে এঁটে উঠতে পারতো তা বিশ্বাস করা শক্ত। তাতে মনে হয় এরা সম্ভবত অন্য শিকারি প্রাণীদের ফেলে যাওয়া মাংস কুড়িয়ে খেত।

কিছু কিছু ভূতাত্ত্বিক ও আবহাওয়াগত পরিবর্তন খাদ্য ও চলাফেরায় পরিবর্তনের ধারায় সহায়তা করে। সাড়ে চার থেকে পাঁচ কোটি বছর আগে পৃথিবীর ভূত্বকের ভারতবর্ষীয় প্লেটটি সরতে সরতে এশীয় প্লেটের গায়ে ধাক্কা দিতে শুরু করে। তার ফলে ধীরে ধীরে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা জেগে ওঠে। এতে বায়ু প্রবাহের পথে যে বাধার সৃষ্টি হয় তাতে সারা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কিছুটা কমে আসে। তার ফলে যে সব এলাকায় আগে ছিল গভীর বন সেখানে বন হালকা হয়ে উঠতে থাকে; যেখানে ছিল হালকা বন সেখানে দেখা দেয় তৃণভূমি। যেখানে ফল আর বাদাম পাওয়া যেত সারা বছর সেখানে এগুলো হয়ে ওঠে মৌসুমী।

খুব সম্ভব শিকারকে তাড়া করে ধরার প্রয়োজনেই ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু অবমানব গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসা আরম্ভ করেছিল। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন এসময়ে এজাতের প্রাণীদের খাবারে বেশ বৈচিত্র্য আসতে শুরু করেছিল; আর এই বৈচিত্র্যের সন্ধান করতে গিয়ে এদের দৃষ্টিশক্তি আর বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ ঘটছিল। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, 'হোমো' বা নর গণ-এর শুরু এই

হাবিলিসদের থেকেই। কোন কোন হোমো হাবিলিস-এর ফসিলের সঙ্গে ধারালো পাথরের হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে ; মনে করা হয় এগুলো দিয়ে তারা হাড়ের ভেতর থেকে মজ্জা খুঁচিয়ে বের করত বা পশুর চামড়া কাটত। আসলে হাতিয়ারের ব্যবহার অন্যান্য জাতের অবমানুষদের মধ্যে আগেও দেখা গিয়েছে। তবে পাথর ভেঙে হাতিয়ার তৈরি করছে এমন মানুষ হাবিলিসরাই প্রথম। সম্ভবত এসময়ে তারা খাবারদাবার জড়ো করার জন্য বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নেবার জন্য ঝুড়ির ব্যবহার আবিষ্কার করে। পরস্পরের মধ্যে খাবার ভাগাভাগি থেকে দেখা দেয় পরিবার ও ভাষার প্রয়োজন।

১৮৯১ সালে মধ্যজাভায় সোলা নদীর ধারে ডাচ চিকিৎসক ইউজিন দুবোয়া আবিষ্কার করেন খাড়া মানবের এক মাথার খুলি। তিনি ছিলেন ডাচ সেনাবাহিনীর শল্যবিদ, কিন্তু তাঁর নেশা ছিল প্রত্নতত্ত্বে । তিনি সেই মানুষের আরো কিছু হাড় পেলেন। দেখা গেল এগুলোর বয়স পাঁচ লক্ষ বছর ; এই মানবের নাম দেওয়া হল পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস, চলতি কথায় জাভা মানব। এদের মাথার খুলির আয়তন ছিল ৯০০ ঘন সে.মি.।

আজ থেকে প্রায় ১৮ বা ২০ লক্ষ বছর আগে হোমো হাবিলিস থেকে উদ্ভব ঘটে হোমো ইরেক্টাস নামে ঋজু নরদের। ১৯৬০ সালে লুইস লীকি অল্ডুভাই গিরিখাতে খুঁড়তে খুঁড়তে এই খাড়ামানবের খুলি পেয়ে যান। এরা উঁচুতে ছিল মোটামুটি সাড়ে পাঁচ ফুট। তাদের মাথা তখনও এপদের মতো ; কপাল অনেকটা গরিলা বা শিম্পাঞ্জিদের মতো। চিবুক নেই বললেই চলে। এদের মগজের আয়তন মোটামুটি ১,০০০ ঘন সে.মি., তাই এদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাও বেশি। প্রথমদিকে এদের মগজ ছিল আজকের চার বছর বয়সের শিশুদের সমান। কিন্তু তবু তারা ছিল আজকের মানুষদের অনেক কাছাকাছি। জাভা মানব আর পিকিং মানবকে এদের নিকট আত্মীয় মনে করা হয়।

চল্লিশ লক্ষ বছর আগের পৃথিবীতে ছিল নানা জাতের অবমানব প্রাণীদের বিচরণ। তাদের কেউ হাতিয়ার তৈরি করে, কেউ সোজা হেঁটে দৌড়ে শিকার করে। এমনিভাবে কেটে গেছে ২০-২৫ লক্ষ বছর। ক্রমে ক্রমে এসব মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে আফ্রিকা থেকে এশিয়ায়। আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগের এমনি খাড়া হয়ে চলা মানুষদের দেখা পাওয়া গেছে ইন্দোনেশিয়ায়, চীনে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ আগুন জ্বালাবার কৌশল শিখে ফেলেছে। তাদের মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্স বা জ্ঞানী মানুষের প্রজাতি। সৃষ্টি হয়েছে হাতিয়ার তৈরিতে, গুহাচিত্র আঁকায় দক্ষ মানুষ। সে মাত্র চল্লিশ হাজার বছর আগের ঘটনা।

হাতিয়ার আর বুদ্ধির বিকাশ

হাতিয়ার মানুষের বিবর্তনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। নানা রকম হাতিয়ার সাহায্য করেছে ফল পাড়তে, কন্দ খুঁড়তে, পশুপাখি শিকার করতে, হিংস্র জন্তুর হাত থেকে

আত্মরক্ষায়। হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহেরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। শুরুতে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত গাছের ডাল আর পাথর; পরে পাথর ধারালো করে তৈরি হয়েছে বর্শা, বল্লম, ছুরি। আগুন জ্বালার কৌশল আবিষ্কৃত হবার পর মানুষ শেখে ধাতুর ব্যবহার : তামা, ব্রোঞ্জ (তামা+টিন), লোহা। এমনি হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সভ্যতার যুগ বিভাগ: পাথরের যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, লোহার যুগ। পাথরের যুগটা বেশ বড়, শেষের দুটোর একেকটা মাত্র কয়েক হাজার বছরের।

১৮৬৮ সালের দিকে ফ্রান্সের ক্রোম্যানিয় নামে এক গ্রামের গুহায় পাওয়া গিয়েছিল আদি মানবের ফসিল, পাঁচ পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল। দক্ষিণ ফ্রান্সে দেয়ালচিত্র ভরা গুহা আবিষ্কৃত হল ১৯৪০ সালে। পথ হারানো কুকুরের সন্ধান করতে গিয়ে চার তরুণ আকস্মিকভাবে গুহাটি দেখতে পায়। এখানে আদি মানবের আঁকা ঘোড়া, বাইসন, ম্যামথ, বল্গাহরিণ, বুনো ষাঁড় এসব ছবি দেখার জন্য এখন প্রতি বছর বহু পর্যটক ভিড় জমান। ক্রোম্যানিয় মানবের ফসিল পাওয়া গেছে আরো অনেক দেশে। সম্প্রতি ১৯৯৫ সালে শভে নামে এক মহিলা ফ্রান্সের আর্ডিনো এলাকায় গুহার ভেতর প্রায় ত্রিশ হাজার বছরের প্রাচীন শিল্পীদের আঁকা আশ্চর্য সৌন্দর্যময় চিত্রমালার সন্ধান পেয়েছেন।

এককালে চীন দেশে ড্রাগনের দাঁত থেকে বানানো হত ওষুধ। এই শতকের বিশের দশকে এমনি এক দাঁত পড়ে চীনা নৃতত্ত্ববিদ পেই ওয়েন চুং-এর হাতে। তিনি বুঝলেন এটা মানুষের মতো কোন হোমিনিডের দাঁত। শুরু হল খোঁজাখুঁজি। পিকিন থেকে ৫৪ কিলোমিটার দূরে চউ-কাউ-তিয়েন নামে গ্রামের কাছে এক প্রাচীন গুহায় পাওয়া গেল প্রায় পাঁচ লক্ষ বছরের পুরনো মানুষের হাড়ের ফসিল। নারী পুরুষ শিশুর অনেক হাড়। আশপাশে ছড়ানো অনেক হাতিয়ার। তার সঙ্গে রয়েছে কিছু আগুন জ্বালাবার চিহ্ন। এদের পুরুষদের মগজের আকার সর্বোচ্চ ১২০০ সি.সি., মেয়েদের সর্বোচ্চ ১০০০ সি.সি.। উচ্চতা ১.৫০ থেকে ১.৬০ মিটার অর্থাৎ পাঁচ ফুটের কিছু বেশি। এরা পাথরের পাতলা ধারালো ছুরি ব্যবহার করত। প্রধান খাদ্য ছিল জীবজন্তুর মাংস, মগজ ও হাড়ের ভেতরকার মজ্জা। এরা ছিল উন্নত খাড়া মানব। আরো নানা জায়গায় পাওয়া গেল খাড়া মানবের ফসিল— জার্মানি, আলজিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা। এমনি খাড়া মানব বা হোমো ইরেক্টাস প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে থেকে নানা দেশে বসবাস করেছে।

আদি হোমো ইরেক্টাস আর হোমো স্যাপিয়েন্স-এর প্রায় সব ফসিলই পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকায় বা তার কাছাকাছি মধ্যপ্রাচ্যে। এশিয়ায় এদের যে সব ফসিল পাওয়া গেল সেগুলো দেখা গেল প্রায় ১০ লক্ষ বছরের পুরনো, আর আফ্রিকায় যেগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো প্রায় ১৮ লক্ষ বছরের পুরনো। তাতে মনে হয় এই আদি মানব আফ্রিকা থেকে ক্রমে ক্রমে এশিয়া ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। হোমো স্যাপিয়েন্সরা তার আগেকার হোমো ইরেক্টাসদের জায়গা নেয় আজ থেকে ৮০,০০০ থেকে এক লক্ষ বছর আগে।

কিন্তু এই মানবরা এভাবে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল কি করে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, সে নিশ্চয়ই তাদের হাতিয়ারের বদৌলতে। হাতিয়ারের সাহায্যে তাদের নানা ধরনের পরিবেশে টিকে থাকতে আর খাদ্য সংগ্রহ করতে সুবিধে হল। সেজন্যই তারা সুবিধেজনক জায়গার খোঁজে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। আর এই উন্নত ধরনের খাবার আর উন্নত জীবনযাত্রা থেকে তাদের বুদ্ধবৃত্তির বিকাশেও সহায়তা হল।

সত্যিকার মানুষ নামে ডাকা যায় এরকম আদি প্রাণী তাই বলা যায় হোমো ইরেক্টাসকেই। এদের বাস ছিল তিন লক্ষ থেকে পনের লক্ষ বছর আগে। আর সবচেয়ে পুরনো হোমো স্যাপিয়েন্স ফসিল পাওয়া গিয়েছে ইজরায়েলের ক্বাফজাহ এলাকায় ; তার বয়স হিসেব করা হয়েছে ৯২,০০০ বছর। তাহলে আমাদের প্রজাতির বয়স হবে এই দু'টি হিসেবের মাঝামাঝি কোন অঙ্ক। সাধারণত দেখা যায় স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রজাতির গড়পড়তা আয়ু হয় দশ লক্ষ বছরের মতো। সে হিসেবে আমাদের প্রজাতির বয়স বেশ কমই বলতে হবে; গড় হিসেবের চারভাগের একভাগের মতো।

আধুনিক মানুষ অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্সদের পাশাপাশি আরো দু'জাতের মানুষের দেখা আমরা পাই। তার একটা হল নিয়াণ্ডারথাল, আরেকটা ক্রোম্যানিয়। নিয়াণ্ডারথালদের দেখা পাওয়া যায় ইউরোপ আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, আজ থেকে প্রায় ৬০,০০০ বছর আগে। তাদের মগজের আকার ছিল প্রায় আমাদের মতোই—— ১৫০০ ঘন সে.মি.। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে তাদের কিছু অবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। ক্রোম্যানিয়রা বাস করত দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে আজ থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার বছর আগে। তারা ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করতে জানত আর পাহাড়ের গুহায় অনবদ্য ছবি আঁকত।

তাহলে মানুষের আদি ইতিহাসের সব কথা কি জানা শেষ হয়েছে? ——মোটেই তা নয়। এখনও আরো অনেক কথাই জানা বাকি রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের আরো আবিষ্কার যে আমাদের জন্য নতুন চমক সৃষ্টি করবে না তা বলা যায় না।

দেবতারাও হয়তো জানেন না

পুরাকালের মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন, "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের চরিত্র স্বর্গের দেবতারাই কিছু বুঝতে পারেন না, মর্ত্যের মানুষ তো কোন্ ছার! —এই তত্ত্বটি আজকের দিনের কথাসাহিত্যিকদেরও বেশ কাজে লাগে। স্ত্রীচরিত্র ছাড়া কথাসাহিত্য একেবারে অচল; আর তাই কথাসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় অম্বিষ্ট হল ক্রমাগত দেবতাদের কাছেও দুর্বোধ্য এই স্ত্রীচরিত্রের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা।

একটু তলিয়ে দেখলে অবশ্য মনে হবে এই আপ্তবাক্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যেটুকু বোঝা যায় তার গভীরে আরো দুটো কথা লুকানো আছে। তার একটা হল সচরাচর 'মানুষ' বলতে মূলত পুরুষ মানুষকেই বোঝায়; তাঁদেরই বড় সমস্যা স্ত্রীচরিত্র বোঝা। আর দ্বিতীয়ত পুরুষদের চরিত্র বোঝা আসলে তেমন একটা কঠিন ব্যাপার নয়— শুধু মেয়েদের চরিত্র বুঝতে মর্ত্যের পুরুষরা তো বটেই দেবতারাও হার মেনে যায়।

চরিত্র বিচারের জন্য এককালে সবচেয়ে সহজ পথ ছিল শিশুর জন্মের সময় থেকে কোষ্ঠী বা ঠিকুজি রাখা। জন্মের মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কোথায় ছিল তা জানতে হলে জ্যোতিষী বা গণকের দরকার; তারপর সে সব কথা লিখে রাখতে হবে কোষ্ঠীতে। শিশুর ওপরে কতটা প্রভাব মঙ্গল, বৃহস্পতি বা শনির এসব থেকে সহজেই বোঝা যায় (অন্তত সেকালে হয়তো যেত) কেমন হবে তার চরিত্র, কেমন হবে তার ভবিষ্যৎ। এ না হয় পুরুষদের বেলা খাটল ; কোষ্ঠী দেখে মেয়েদের চরিত্র বা ভাগ্য কি একেবারেই বোঝা যেত না? হয়তো কিছুটা যেত, আর সেসব খবর খুব কাজে লাগত বিবাহাদি শুভকর্মে।

সব দেশে বা সব লোকে যে আবার এসব কোষ্ঠী বা ঠিকুজির ওপর খুব একটা ভরসা করত তা হয়তো না। তাই কারো চরিত্রের চালচিত্র বোঝার আরো নানা উপায় নানা দেশে চালু হয়। যেমন, একটা উপায় হল হাতের রেখা দেখে চরিত্র আঁচ করা ; আরেক উপায় হল নাক বা মুখের গড়ন অথবা মাথার আকৃতি দেখে চরিত্রের চালচিত্রের হদিস করা। জন্মের সময় অকালপ্রজ্ঞ নিউটনের মাথার আকার ছিল বেঢপ রকমের ; সে শিশু বড় হয়ে জড়বুদ্ধির হবে বলেই সকলে মনে করেছিল। চার্লস ডারউইনের নাক ছিল রীতিমতো খাঁদা ; মুরুব্বিরা তাই তাঁর ছোটকালেই রায় দিয়েছিলেন, এ ছেলের তেমন বুদ্ধিমান হবার কোন আশা নেই। শেষ পর্যন্ত নিউটন বা ডারউইনের নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ প্রমাণিত হয় নি; কিন্তু তাতে এই পদ্ধতির ওপরে সব মানুষ যে এর মধ্যে খুব বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে তাও মনে হয় না।

আমাদের আশপাশের যে সব নানা মাপের নানা চেহারার বহুবিচিত্র লোকের সমাবেশ তাদের মধ্যে কার চরিত্র কেমন সেটা বোঝার জন্য সেই আদিকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মানুষের ভাবনাচিন্তার অন্ত নেই। এই যে আমার সামনে লোকটা সে কি সুস্থ না অসুস্থ ; সে কি পরিশ্রমী না আলসে; লোকটা কি বুদ্ধিমান না হাবাগোবা? এসব ভাবনা যেমন ডাক্তারের তেমনি মনস্তত্ত্ববিদের, শিক্ষক, সাহিত্যিক, কারখানা মালিক, ব্যবসায়ী— মানুষজন নিয়ে কাজ-কারবার এমন সবারই।

পাছে লোকে বুঝতে ভুল করে তাই নিজের চরিত্র নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেবার লোকেরও অভাব নেই। নির্বাচনের সময় হয়তো দেখা যাবে দেয়ালের লেখন "অমুকের চরিত্র, ফুলের মতো পবিত্র।" ফিলিপাইনের প্রাক্তন 'ফার্স্ট লেডি' ইমেলদা মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তি কখনো ভোলার নয়, "আমার মনটা আসলে খুব সুন্দর, তা নইলে কি আর আমার মুখটা এমন সুন্দর হত?" আমাদের দেশের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিও একবার জনতার সামনে নিজের হাতের তালু মেলে দিয়ে বলেছিলেন, "দেখুন আমার হাতে কোন রক্তের দাগ নেই ; আমার মনটাও এমনি পরিচ্ছন্ন।" —কিন্তু যাদের উদ্দেশে বলা তারা যদি সবাই সরল মনে এসব কথা বিশ্বাস করত তাহলে এ পৃথিবীতে কত জটিলতাই না এড়ানো যেত!

অবশেষে চরিত্রের হদিস

অবশেষে বিশ শতকের শেষে এসে মানুষের চরিত্রের চালচিত্র হদিস করার অনেকটা নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক কায়দা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিতভাবে জেনেছেন মানুষের (এবং সেই সঙ্গে অন্য সব প্রাণী ও উদ্ভিদের) সব ধরনের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার জীবকোষের কেন্দ্রকে যেসব ক্রোমোজোম তন্তু রয়েছে তাতে লুকানো জিনকণার সাঙ্কেতিক ভাষায়। জিনকণার এই সাঙ্কেতিক ভাষার তাঁরা পাঠোদ্ধার করতেও শিখেছেন, তারপর সেই ভাষাকে কাজে লাগাচ্ছেন দেহে জিনগত কোন ত্রুটি থাকলে তা দূর করার জন্য বা জিন সমাবেশে পরিবর্তন এনে তার চরিত্র বা গুণাগুণ বদলে দেবার কাজে।

সব জীবদেহের গাঁথুনি তৈরি হয় কোষের সমাবেশে। জীবদেহ তৈরি অসংখ্য কোষে, নানা ধরনের কোষে। উদ্ভিদের কোষ এক ধরনের, প্রাণীদের কোষ অন্য ধরনের। আবার প্রাণীদের মধ্যেও বিকাশের স্তর অনুযায়ী কোষের ভিন্নতা আছে। ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু তৈরি একটি মাত্র কোষে, অথচ মানুষের দেহে রয়েছে মোটামুটি এক কোটি কোটি কোষ। একের পিঠে চৌদ্দটা শূন্য বসালে সংখ্যাটা পাওয়া যায়; এমন বিশাল একটা সংখ্যা কল্পনা করাও বেশ শক্ত।

মানুষের দেহে জননকোষ ছাড়া অন্য সব কোষের কেন্দ্রে আছে ২৩ জোড়া আণুবীক্ষণিক ক্রোমোজোম তন্তু; এর মধ্যে ২২ জোড়া একজাতের—তাদের বলা হয় অটোজোম ; আরেক জোড়ায় থাকে স্ত্রী-পুরুষবাচক 'এক্স' বা 'ওয়াই' জাতের তন্তু। কাজেই সব মিলিয়ে কোষে ক্রোমোজোম তন্তুর সংখ্যা ৪৬। মেয়েদের শরীরের কোষে ২২ জোড়া অটোজোম ছাড়া যে ক্রোমোজোম জুটি রয়েছে তাতে

থাকে একজাতের বেশ লম্বামতো দু'টি কোষ, তাদের বলা হয় X; ছেলেদের দেহকোষে ২২ জোড়া অটোজোম ছাড়া যে ক্রোমোজোম জুটি থাকে তার মধ্যে একটি বেশ বড়সড় আর লম্বাটে, সেটি X; অন্যটি রীতিমতো বেঁটেখাটো, তাকে বলা হয় Y। X জাতের তন্তু দায়ী মেয়ের গুণাগুণের জন্য, আর Y জাতেরটি ছেলের গুণাগুণের জন্য।

ছেলে আর মেয়ে উভয়েরই জননকোষে আবার থাকে অর্ধেক সংখ্যক অর্থাৎ মাত্র ২৩টি করে ক্রোমোজোম তন্তু; আর তাদের মিলনের ফলে তৈরি হয় ৪৬টি ক্রোমোজোমযুক্ত নিষিক্ত ভ্রূণকোষ। মায়ের জননকোষের X তন্তুর সঙ্গে যদি বাবার X তন্তু যুক্ত হয় তাহলে সেই দু'টি X তন্তুযুক্ত সন্তান হয় মেয়ে, আর মায়ের জননকোষের X তন্তুর সঙ্গে যদি বাবার Y তন্তু যুক্ত হয় তাহলে সে সন্তান হয় ছেলে।

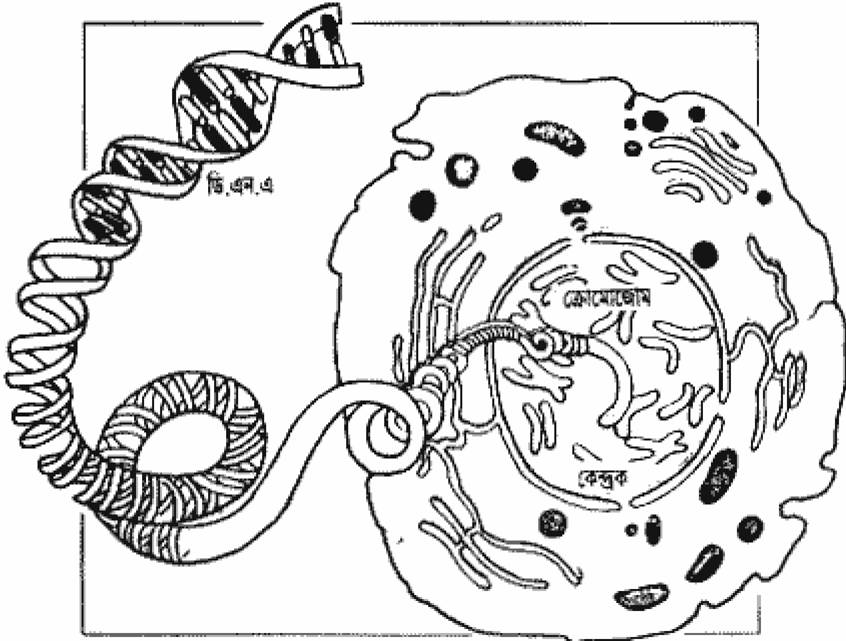
এসব ক্রোমোজোম তন্তুর প্রধান উপাদান হল প্রোটিন আর ডি.এন.এ. নামে অণুর শেকল। এই ডি.এন.এ. অণুর কিছু খণ্ড মিলিয়ে তৈরি হল একেকটি জিন কণা। এসব জিনের আকার যে কত সূক্ষ্ম তার একটা হিসেব এভাবে দেয়া যায়। মানুষের আঁতে রয়েছে এশেরিখিয়া কোলাই নামে এক ধরনের জীবাণু; তাদের সংক্ষেপে বলা হয় 'ই. কোলাই'। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখতে এদের দেখায় লম্বা লম্বা বেলুনের মতো। এমনি জীবাণু হাজার চারেক পরপর লম্বালম্বি সাজালে হয় এক সেন্টিমিটারের সমান। অথচ এই এককোষী জীবাণুর প্রতিটির বুকে রয়েছে প্রায় চার হাজার জিনকণা।

উন্নত জাতের উদ্ভিদ বা প্রাণীর জটিলতা যত বাড়ে তত তাদের জীবকোষে জিনকণার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। মানুষের কোষে জিনকণার সংখ্যা ধরা হয় মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ। অবশ্য এই হিসেবে কিছুটা হেরফের আছে— সংখ্যাটা কিছু বেশি বা কিছু কম হওয়াও বিচিত্র নয়।

১৯৫৩ সালে ডি.এন.এ. অণুর গড়ন আবিষ্কার করে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন জেমস ওয়াটসন নামে এক চব্বিশ বছর বয়সী মার্কিন জীববিজ্ঞানী আর ফ্রান্সিস ক্রিক নামে এক ছত্রিশ বছর বয়সের ব্রিটিশ পদার্থবিদ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সূক্ষ্ম এক্স-রে পরীক্ষা থেকে তাঁরা দেখালেন ডি.এন.এ. অণুর আকার ডান দিকে পেঁচানো একটা মই-এর মতো জোড়কুণ্ডলীতে সাজানো। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁরা ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

জীবদেহের নানা জৈব ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় অসংখ্য নানা ধরনের প্রোটিন বস্তু তৈরির মাধ্যমে— যেমন হরমোন, এনজাইম বা উৎসেচক এবং রোগ-অনাক্রমক্ষমতা সৃষ্টির প্রোটিন। এসব প্রোটিন সৃষ্টির সঙ্কেত আসে আবার ডি.এন.এ. অণুর ভেতরে সাজানো জিনকণার সাঙ্কেতিক ভাষা থেকে। লাল রক্তকোষ ছাড়া অন্যসব জীবকোষের কেন্দ্রে থাকে অম্লজাতীয় বস্তুতে তৈরি এসব জিনকণা; এই অম্লের ভেতর আছে ডিঅক্সিরাইবোজ নামে একরকম শর্করাবস্তু। তাই এই অম্লের নাম দেয়া হয়েছে ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লেইক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি.এন.এ.।

দেখা গেল ডি.এন.এ.-র যে পেঁচানো সিঁড়ির মতো গড়ন তার দু'পাশের কাঠামোয় রয়েছে শর্করা আর ফসফেট জাতের বস্তু, আর মাঝখানের ধাপগুলো তৈরি দু'জোড়া করে ক্ষারক জাতের বস্তুতে। চার রকম ক্ষারক দিয়ে তৈরি এসব জুটি। এই চার



● *জীবকোষের কেন্দ্রকে আছে ক্রোমোজোম তন্তু; তার ভেতর ডি.এন.এ.-র পেঁচানো সিঁড়িতে রয়েছে জিনকণার সমাবেশ। আমাদের দেহের প্রতিটি জীবকোষের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে জিনকণা।*

ধরনের ক্ষারকের নাম হল অ্যাডেনিন (এর জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় A), সাইটোসিন (সাঙ্কেতিক চিহ্ন C), থাইমিন (সাঙ্কেতিক চিহ্ন T) আর গুয়ানিন (সাঙ্কেতিক চিহ্ন G)। এদের মধ্যে জুটি বাঁধারও আবার বিশেষ নিয়ম আছে। অ্যাডেনিন-এর সঙ্গে সব সময় জোট বাঁধবে থাইমিন; সাইটোসিন-এর সঙ্গে কেবল জোট বাঁধে গুয়ানিন। বিজ্ঞানীদের সাঙ্কেতিক ভাষায় এধরনের জোট বাঁধাকে লেখা হয় এভাবে : A-T আর C-G জুটি। কম্পিউটারের ভাষায় যেমন শুধু ০ আর ১ এই দু'টি সংখ্যার সমাবেশ ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ তথ্য আর তার প্রয়োগের নির্দেশমালা ধারণ করা হয়, তেমনি জীবদেহের জিনসমাবেশে, আর এই চার রকম ক্ষারকের সমাবেশে লুকানো থাকে তার আকার-প্রকার, রীতি- প্রকৃতি, জীবন ধারণ, চালচলনের সব গোপন খবর।

তাহলে জীবদেহের কোষের কেন্দ্রকে আছে ক্রোমোজোম তন্তু, তাতে অতি সূক্ষ্ম আর লম্বা পেঁচানো সিঁড়ির মতো ডি.এন.এ.-র সুতো; এই সিঁড়ির খানিকটা করে খণ্ড নিয়ে হল একটি করে জিনকণা। প্রতিটি জিনকণা তৈরি মাত্র চার ধরনের ক্ষারক অণু

জুটির বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ দিয়ে। আর প্রতিটি জিন নির্দেশ দিতে পারে দেহের জন্য দরকারি বিশেষ বিশেষ প্রোটিন তৈরির। প্রোটিন হল দেহ গঠন আর দেহের কাজকর্ম চালানোর জন্য অত্যন্ত জরুরি নানা রকম জটিল রাসায়নিক অণু; এগুলো আবার তৈরি অ্যামাইনো অ্যাসিড নামে অম্লের অসংখ্য খণ্ডের শেকল মিলিয়ে। জিনের গায়ে যে ক্ষারকের সমাবেশ তার ধরনই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে সে জিনটি কোন্ ধরনের প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেবে।

জিনকণায় দেহের গোপন খবর

দেখা গেল প্রোটিনের মূল উপাদান অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে ২০ রকমের ; আর জিনের যেসব ক্ষারকের সঙ্কেতে এসব অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয় তাতে আছে A, C, T আর G এই মাত্র চারটি অক্ষর। এসব অক্ষরের সমাবেশে জিন কিভাবে এত রকম প্রোটিন তৈরি করে তার রহস্য কিছুটা বোঝা গেল ষাটের দশকে এসে। দেখা গেল আসলে মাত্র তিনটি ক্ষারকের নির্দেশই কোন একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরির জন্য যথেষ্ট। যেমন AAA সঙ্কেত দিয়ে তৈরি হয় লাইসিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড; GGG সঙ্কেত দিয়ে তৈরি হয় গ্লাইসিন; CTG সঙ্কেত দিয়ে তৈরি হয় লিউসিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরির সঙ্কেতের এই রহস্য ভেদ করেছিলেন হরগোবিন্দ খোরানা নামে এক ভারতীয়-মার্কিন বিজ্ঞানী আর তাঁর সহকর্মীরা।

অণুর বর্ণমালায় যদি থাকে মোট চারটি অক্ষর আর প্রতিটি শব্দ তৈরিতে দরকার হয় মাত্র তিনটি করে অক্ষর তাহলে সহজ গণিতের নিয়মে বোঝা যায় জিনের ভাষায় এভাবে মোট ৬৪টি শব্দ তৈরি করা যায়। অথচ অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে মাত্র ২০ রকম। তার মানে যতগুলো শব্দ তৈরি করা যায় তার অনেকগুলোই হয়ে দাঁড়ায় বাড়তি। অর্থাৎ একই অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হতে পারে বেশ ক'টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সঙ্কেতে। দেখা গেল সত্যিই তাই ; যেমন CTG ছাড়া আরো পাঁচটি শব্দের সঙ্কেতে তৈরি হতে পারে একই লিউসিন।

জিনের এই সঙ্কেত ভাঙার পর এবার যে-কোন জীবদেহের সব ধরনের গুণাগুণের রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়ে উঠল। তবে কাজটা যে সহজ তা মোটেই নয়। একে তো জীবকোষ নিজেই আণুবীক্ষণিক; তার ভেতরকার ক্রোমোজোম আর ডি.এন.এ. তো আরো অতি আণুবীক্ষণিক। কাজেই সে ডি.এন.এ.-র খণ্ডগুলোকে আলাদা আলাদা করে চোখে দেখার কোন উপায় নেই। তাছাড়া একটা ডি.এন.এ.-র খণ্ড কোথায় শেষ আর কোথায় আরেকটার শুরু তাও বোঝার মতো কোন চিহ্ন নেই।

এজন্য বিজ্ঞানীরা বুঝতে চেষ্টা করছেন কোষ বিভাজনের সময় ডি.এন.এ.-রা কিভাবে তাদের প্রতিরূপ তৈরি করে আর তার ফলে দুটো হুবহু একই রকম নতুন কোষ তৈরি হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালে জানা গেল কোষ বিভাজনের সময় প্রথমে ডি.এন.এ.-র একজোড়া সুতোর মধ্যে একটি মূল সুতো থেকে যায়, আরেকটি হয়ে দাঁড়ায় নতুন কোষের অংশ। তারপর দুটো কোষই তৈরি করে তাদের প্রতিরূপ

সুতো। দেখা গেল কোষ ভাগ হবার আগে কেন্দ্রকের মধ্যে ডি.এন.এ.-র সুতোর ওপর দিয়ে লম্বালম্বি একটা এনজাইমের প্রবাহ বয়ে যায়; তাতে জিপার খোলার মতো করে সে সুতোর জোড় খুলে যায়। দুটো ডি.এন.এ.-র সুতো পৃথক হয়ে পড়ে, তাদের প্যাঁচও খুলে যায়। কেন্দ্রকের ভেতরকার ক্ষারক আর অম্লবস্তু থেকে কিছু এসে দুটো খণ্ডের সঙ্গে খাঁজে খাঁজে জোড়া লাগতে থাকে। যেমন সুতোর যেখানে আছে অ্যাডেনিন (A) সেখানে কেন্দ্রবস্তু থেকে এসে জোড়া লাগে থাইমিন (T), সাইটোসিন (C) এসে জোড়া লাগে গুয়ানিন (G)-এর সঙ্গে। এভাবেই তৈরি হয় ঠিক আগেরটির অনুরূপ একটি জোড়কুণ্ডলী।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন যেসব জিন প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয় (ধরা যাক তাদের বলা হল কাঠামো জিন) সেগুলো ছাড়া আরেক রকম জিন আছে যাদের কাজ হল অনেকটা সুইচের মতো ; এরা কাঠামো জিনকে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করে। বিশেষ বিশেষ জিনের কাজ শুরু করা বা বন্ধ করার নির্দেশ দেবার এই ব্যবস্থা জীবাণুদের নানা রকম প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য খুব জরুরি। অবশ্য উচ্চতর জীব যারা কিছুটা সুস্থির পরিবেশে বাস করে তাদের জন্যও এই ব্যবস্থাটা খুব কাজের। যেমন আমাদের গায়ের চামড়া, হাড়, পেশি বা স্নায়ুতে রয়েছে হুবহু সমান সংখ্যায় ক্রোমোজোম আর সমান পরিমাণ ডি.এন.এ.। তবে তাদের বিশেষ ধরনের গড়ন, বিশেষ কাজের উপযোগী এনজাইম আর অন্যান্য প্রোটিন সবই তাদের বিশেষ বিশেষ জিনের নির্দেশে তৈরি হয়; অন্য বেশ কিছু জিন থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে। আর এজন্যই চামড়ার কোষ চামড়ার কাজ করে যেতে পারে, মগজের কোষের কাজ করার চেষ্টা করে না। অবশ্য কখনও কখনও অসুখ-বিসুখ বা অন্য কারণে এসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করে না, যেমন ক্যানসার হলে দেহের কিছু কিছু কোষ বেয়াড়া রকম আচরণ করতে শুরু করে। কোষ বিভাজনের সময় ছোটখাট ত্রুটি ঘটলে তা মেরামত করার জন্য আবার পৃথক জিন আর পৃথক এনজাইম রয়েছে; তবে কখনও কখনও এসবও অকেজো হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন গড়ে প্রতি একশটি শিশুর মধ্যে অন্তত একটি জন্মায় কোন মারাত্মক ত্রুটি নিয়ে। এসব জন্মগত ত্রুটি ঘটতে পারে প্রায় চার হাজার ধরনের। তার প্রকাশ ঘটতে পারে শারীরিক, মানসিক বা উভয় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে। তাতে প্রায়শ এমন প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে দুঃসহ : তাদের নিজেদের জীবনে তো বটেই অনেক সময় পরিবারের অন্যদের জন্যও নানা দুর্ভোগ নেমে আসে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবন হয় স্বল্পায়ু।

এসব রোগের চিকিৎসার জন্যও সবচেয়ে বেশি দরকার দেহকোষে জিনদের অবস্থান আর তাদের কিভাবে রদবদল ঘটানো যায় তার কথা জানা। তবে এই জানার কাজটি মোটেই সহজ নয়। একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, দেহকোষে একটি ত্রুটিপূর্ণ জিন খুঁজে বের করার সঙ্গে তুলনা চলে যদি আপনাকে বলা হয় আমেরিকার পুব আর পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে একটি বাড়িতে একটি বিজলির বাল্ব জ্বলে গিয়েছে, বাড়ির ঠিকানা বা শহরের নাম, এমন কি কোন্ অঙ্গরাজ্যে তাও জানা নেই, এবার

জায়গাটি খুঁজে বের করুন। আরেক সমস্যা হল অনেক সময় দেখা যায় দেহের কোন একটি গড়ন বা গুণ (যেমন চোখের রঙ) বা কাজের জন্য একটি মাত্র জিন দায়ী নয়, বরং অনেকগুলো জিন মিলিতভাবে দায়ী; তেমনি জন্মগত ত্রুটিও ঘটতে পারে দেহের অনেকগুলো জিনের মিলিত ত্রুটির কারণে।

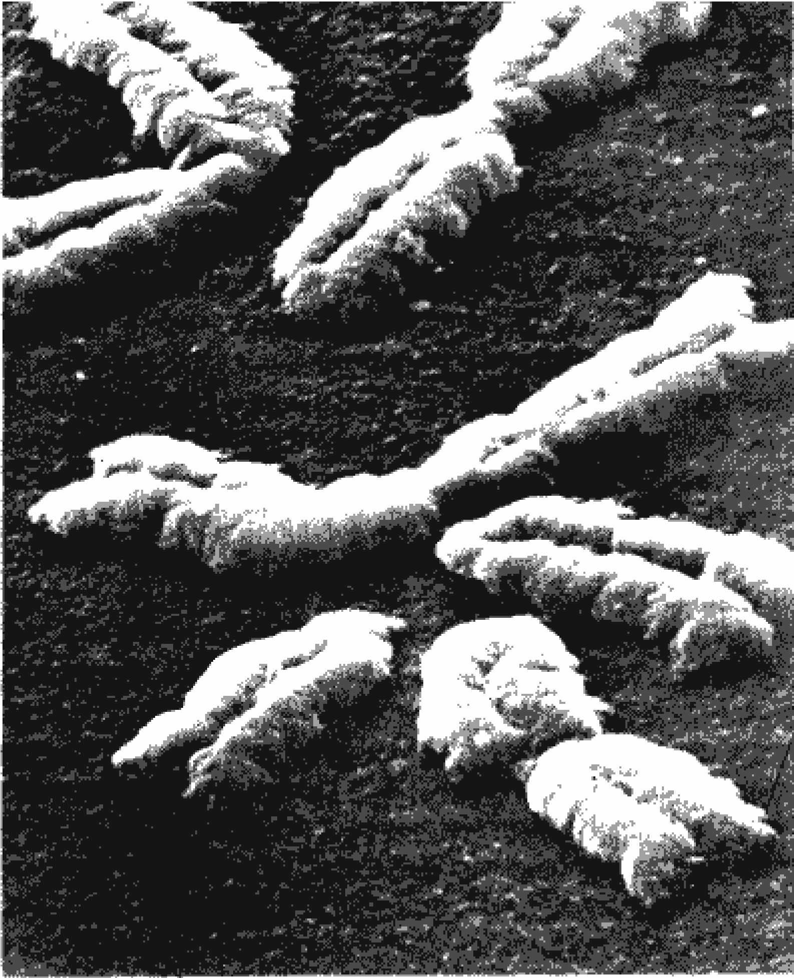
জিন সমাবেশের মানচিত্র

অবশ্য এসব কারণ আজকের বিজ্ঞানীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। অতিদূর নক্ষত্রলোকের নানা অজানা তথ্য যে মানুষ তার নখদর্পণে এনে ফেলতে চাইছে সে যে তার নিজের দেহের সকল গভীর রহস্য উদ্ধার করতে চাইবে সেকথা তো না বললেও চলে। তাই আজ মানুষের সমগ্র জিন সমাবেশের মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের সঙ্গে এজন্য একটি বিশেষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—তার নাম সেন্টার ফর হিউম্যান জিনোম রিসার্চ। ১৯৮৮ সালে এই প্রকল্পের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন ডি.এন.এ-র গড়ন যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন সেই জেমস ওয়াটসন; এর মধ্যে তিনি এ প্রকল্প থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। এখন এ প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন ফ্রান্সিস কলিন্স।

প্রকল্পটি বিশাল ও জটিল। প্রথম পর্যায়ে ১৯৯০ থেকে পাঁচ-ছ' বছরে তৈরি হবার কথা মানুষের সমগ্র জিন সমাবেশের একটি কাঠামোগত মানচিত্র। মানুষের দেহের কোষে যে মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ জিনকণা আছে তাতে লুকানো রয়েছে প্রায় তিনশ' কোটি ক্ষারক। কিন্তু মোট ডি.এন.এ. সমাবেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় সঙ্কেত বহন করে এমন ডি.এন.এ. মাত্র তিন শতাংশের মতো; বাকিটা কি শুধুই আবর্জনা প্রোটিন, না কি জিনকণা তৈরিতে তাদেরও কিছু দরকারি ভূমিকা আছে? এসব আরো ভাল করে জানা যাবে প্রাথমিক ভৌত মানচিত্র তৈরি হলে।

বিজ্ঞানীরা মানুষের লাখ খানেক জিনকণার মধ্যে এযাবৎ মাত্র কয়েক হাজার জিনের খবরাখবর যোগাড় করেছেন; পুরো কাজ শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। প্রাথমিক কাজে প্রতি জোড়া ক্ষারকের তথ্য জানার জন্য মাত্র এক ডলার খরচের হিসেব ধরলেও মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় তিনশ' কোটি ডলার।

প্রাথমিক মানচিত্র তৈরির কাজ শেষ হবার পর শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ—অর্থাৎ প্রতিটি জিন কণার ভেতরে প্রতিটি ক্ষারকের অবস্থান বের করা। তাতে লাগবে আরো অন্তত দশ বছর সময়। খরচের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়াতে পারে এক হাজার কোটি ডলার। পরমাণু-শক্তির ব্যবহার, মহাকাশ বিজয়, তারকাযুদ্ধ এসব বড় রকম বৈজ্ঞানিক প্রকল্পে এর আগে যে ধরনের অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তার তুলনায় এই অঙ্ক অবশ্য এমন কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর সমরাস্ত্র খাতে যে ব্যয় করে তার তুলনায় এ হিসেব এক শতাংশেরও কম। কিন্তু জীববিদ্যার গবেষণায় এত বড় আর এমন দুঃসাহসী প্রকল্প মানুষের ইতিহাসে আর কখনও নেয়া হয় নি। ২০০৫ সাল নাগাদ মানবদেহের পুরো জিন মানচিত্র তৈরি হলে তা তের সেট এনসাইক্লোপিডিয়া



■ মানুষের ক্রোমোজোম তন্তু- ৩৫,০০০ গুণ বড় করে দেখানো। এর ভেতরেই আছে ডি.এন.ই জনকণা- আমাদের সকল গুণাগুণের আধার।

ব্রিটানিকার সমান হবে।

প্রকল্পের কাজ শুরু হতেই বিজ্ঞানীরা দেখলেন মানুষের 'জিনোম' বা জিন সমাবেশের মানচিত্র যদি তৈরি করাও হয় তাহলে তার যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য আরো কিছু সরল জীবের জিন সমাবেশের মানচিত্র আগে তৈরি করে নেয়া দরকার। সেজন্য প্রথম যে এককোষী জীবটিকে নেয়া হল সে আমাদের অতি পরিচিত ঈস্ট বা খমির। ঈস্টের কোষে আছে ১৬টি ক্রোমোজোম তন্তু, প্রায় ৬,৫০০টি জিন আর তাতে প্রায় ৩,৭০,০০০ ক্ষারক জুটি। এর মানচিত্র তৈরিতে ডজনখানেক দেশের ৩৭টি গবেষণাগারে প্রায় সেড়শ' বিজ্ঞানী কাজ করছেন; আর তাতে দু'বছরের পরিশ্রমে

মানচিত্র তৈরি প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শেষ হয়েছে।

এরপর নেয়া হয়েছে এশেরিখিয়া কোলাই (ই. কোলাই) জীবাণুর জিন সমাবেশ; এতে রয়েছে প্রায় ৫০,০০,০০০ ক্ষারক জুটি। এর ক্ষারক সমাবেশের মানচিত্র তৈরি এর মধ্যে অনেকটা এগিয়েছে। ইতোমধ্যে ইঁদুর, শূকর এমনি আরো কিছু প্রাণীর জিন সমাবেশের মানচিত্র তৈরির কাজও হাতে নেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও জাপান, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, চীন প্রভৃতি অনেক দেশে আজ মানুষের এই জিন-মানচিত্র তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে।

আদতে শুধু কোন একটি বা গুটিকয়েক দেশ যদি এই জিন-মানচিত্র তৈরির প্রযুক্তি আয়ত্ত করে তাহলে অন্য সব দেশের জন্য তার ফল মারাত্মক হতে পারে। তাই এর মধ্যেই এই প্রকল্পের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক নিয়ে দুনিয়া জোড়া আলোড়ন শুরু হয়েছে।

চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং সামগ্রিকভাবে মানব কল্যাণে এই প্রযুক্তির যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তা আজ অতি স্পষ্ট। আগেই বলেছি, বিজ্ঞানীরা এযাবৎ প্রায় চার হাজার রকম ব্যাধিকে শনাক্ত করেছেন যেগুলো মূলত বংশগতভাবে সংক্রমিত হয়; অর্থাৎ বাবা, মা বা পূর্ব প্রজন্মের কারো জিনে ত্রুটি থাকলে উত্তর পুরুষে এসব মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। আবার কোন কোন রোগ আছে যেগুলো বাবা বা মা যেকোন একজনের জিনের ত্রুটিতে সংক্রমিত হয় না, দু'জনেরই জিনে যদি একই ধরনের ত্রুটি থাকে তাহলেই কেবল সন্তান-সন্ততিতে সে রোগ দেখা দেয়। এসব গবেষণার ফলে যদি এখন থেকে যেকোন লোকের জিনগত গুণাগুণ নখদর্পণে এনে ফেলা যায় তাহলে তা যে কেবলই তার রোগ নিরাময়ে প্রয়োগ করা হবে, এসব তথ্যের (কখনো হয়তো ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্যের) কারণে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগে বা অন্যভাবে তাকে হয়রানির শিকার হতে হবে না তার নিশ্চয়তা কি?

তাছাড়া জিনসমাবেশে পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবাণুকে দিয়ে আজ মূল্যবান ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে, উদ্ভিদ বা প্রাণীর জাত উন্নত করে তোলা হচ্ছে---- তাদের মধ্যে উন্নত গুণাগুণ আরোপ করা যাচ্ছে। দুধেল গাইয়ের দুধ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, লাল টকটকে শাঁসালো টম্যাটো জন্মানো যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক তেমনি যদি হিটলারের মতো কোন জাত্যভিমানী একনায়ক সমগ্র জাতির গুণাগুণ এই নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে তার ইচ্ছেমতো বদলে দেবার চেষ্টা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কি কোন প্রতিষেধক থাকবে?

বার্নার্ড শ'কে নাকি এক সুন্দরী তন্বী বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন, আপনার মেধা আর আমার সৌন্দর্যের মিলন হলে কী অসাধারণ সন্তানের জন্ম হতো! শ' তার জবাবে বলেছিলেন, আর যদি তার উল্টোটা ঘটে গিয়ে আমার কদর্য চেহারা আর আপনার বুদ্ধির মিলন হয় তাহলে কি দশা হবে তা কি ভেবে দেখেছেন?

মানব চরিত্রের মানচিত্র তৈরির যে নতুন প্রযুক্তি আজ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছে তা এ ধরনের সমস্যার সমাধান দিতে পারবে কি?

উন্নয়নের গোড়ায় হল উদ্ভাবন

যুগে যুগে মানুষের সভ্যতার কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে নানা রূপ নিয়ে। তার মধ্যে পড়ে ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও নৈতিকতা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি নানা প্রপঞ্চ। কিন্তু আজ এই বিশ শতকের শেষে দাঁড়িয়ে আর সব কীর্তিকে ছাপিয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিই যেন সব দেশের অর্থনীতি আর জীবনধারার প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে নানা দেশের বিজ্ঞানী আর অর্থনীতিবিদরা বেশ কিছুকাল ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছেন। বিশেষ করে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে অর্থনীতিবিশারদরা উন্নয়ন এবং তাতে মানব সম্পদের ভূমিকা— বিশেষ করে মানুষের উদ্ভাবনমূলক কাজের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। এসব গবেষণা আজকের দিনে মানুষের অগ্রযাত্রায় নতুন হাতিয়ার শুধু নয়, যেন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

উদ্ভাবনশীলতা আসলে মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। বিবর্তনের ধারা বেয়ে মানুষের মস্তিষ্কের ওপরের স্তর কর্টেক্স-এ যেমন এক থেকে দেড় হাজার কোটি স্নায়ুকোষের বিস্তীর্ণ জটাজাল সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি বেড়েছে তার মেধা ও উদ্ভাবন ক্ষমতা। এই উদ্ভাবনশীলতার বলেই মানুষ হয়ে উঠেছে সকল সৃষ্টির সেরা, 'আশরাফুল মখলুকাত', প্রতিষ্ঠা করেছে সারা পৃথিবীর ওপর তার অপ্রতিহত আধিপত্য। কিন্তু সব মানুষের মধ্যেই কি এই উদ্ভাবনশীলতা সমান মাত্রায় রয়েছে, নাকি তাতে ঘটে বড় রকম হেরফের? আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখি কোন কোন ছেলে বা মেয়ে খুব অল্প বয়স থেকেই হয় অতিমাত্রায় চটপটে, কিংবা হয়তো থাকে চুপচাপ অথচ আঁকে আশ্চর্য সুন্দর ছবি বা তৈরি করে চমৎকার ছড়া বা কবিতা; আবার কেউ যথেষ্ট বয়স হলেও তেমন চৌকস হয় না। কারো প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় খুব কম বয়সে, কারো-বা প্রতিভা প্রকাশ পায় বেশ কিছুটা বয়স হবার পর। কারো মেধার প্রকাশ ঘটে গণিতে বা বিজ্ঞানে, কারো-বা সাহিত্যে কিংবা আর কোন ক্ষেত্রে। প্রায়শ পরিবারের সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার সঙ্গে (এমন কি কখনও কখনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গেও) মানুষের উদ্ভাবনশীলতার তেমন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোন কোন মানুষের মধ্যে উদ্ভাবনশীলতা কেন অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় প্রকাশ পায় আবার কারো মনে হয় ঘাটতি রয়েছে? তাতে কতটা ভূমিকা বংশগতির আর

কতটাই-বা পারিপার্শ্বিক প্রভাব বা শিক্ষার? কোন কোন জাতির মধ্যেই-বা কেন উদ্ভাবনশীলতা বেশি দেখা যায়? সাম্প্রতিককালে বেশির ভাগ নোবেল প্রাইজ জুটছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের, অথচ ব্যবহারিক পণ্য উদ্ভাবনে তারা মার খাচ্ছে জাপানিদের হাতে। সব মানুষের মধ্যে কিভাবে উদ্ভাবনশীলতা বিকশিত বা সঞ্চারিত করা যায়? উদ্ভাবনকে কিভাবে চালিত করা যায় জাতীয় জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোর দিকে? উদ্ভাবনের ফলাফল কিভাবে দ্রুত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়? —এমনি ধরনের অজস্র প্রশ্ন আজ আলোড়িত করছে সারা পৃথিবীর মানুষকে। এসব প্রশ্নের জবাব নিঃসন্দেহে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে; এসব প্রশ্নের উত্তর পেলে জাতীয় নীতিকে সে অনুযায়ী পরিচালিত করা যায়।

উন্নয়ন ও উদ্ভাবন

গত দু'শ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানকে কাজে লাগিয়ে যে ঐতিহাসিক ধারায় পাশ্চাত্যের দেশগুলি আজকের উন্নতির স্তরে পৌছেছে তাকে অর্থনীতিবিদরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই শতকের মাঝামাঝি উন্নয়নের ধারা বিশ্লেষণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন উইলিয়াম ডব্লিউ রস্টো (William W. Rostow)। উন্নয়নের স্তর অনুসারে বিভিন্ন সমাজকে তিনি পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছিলেন : সনাতন সমাজ ; ক্রান্তিকালের সমাজ ; ব্যাপক উন্নয়ন স্তরের সমাজ; পরিণত অবস্থার দিকে যাত্রার সমাজ ও পরিণত অর্থনীতির সমাজ— যে স্তরে নিতান্ত মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে অতিরিক্ত ভোগ্যসামগ্রী মানুষের আয়ত্ত হয়।

কিন্তু এই যে অতিরিক্ত মাত্রায় ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদনের আগ্রহ বা প্রেরণা, এটা মূলত কোথা থেকে আসে? আজকের অর্থনীতিবিদরা সাধারণভাবে মনে করেন এটা আসে উদ্যোগী ব্যক্তিদের কাছ থেকে; তারাই মূলত সব উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্র, সব অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলে। তাদের সবার মূল লক্ষ্য যে সব সময়ই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য নতুন কোন পণ্য বা নতুন কোন পদ্ধতি চালু করা, নতুন কিছু সৃষ্টির আনন্দই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান প্রেরণা। মনস্তত্ত্ববিদরা বিভিন্ন দেশের অতীত দিনের রূপকথা বা গল্পকাহিনীতে সাফল্যের প্রেষণা নিয়ে গবেষণা করেছেন। দেখা গেছে যেসব দেশের সাহিত্যে সাফল্যের প্রেষণা উঁচু মানের তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তত দ্রুত হয়েছে।

এডওয়ার্ড ডেনিসন (Edward F Denison), থিওডোর শুল্জ (Theodore T Schulz), আর্থার লিউইস (Arthur Lewis), ফ্রেডারিক হারবিসন (Frederick Harbison), চার্লস মায়ার্স (Charles Myers), ফ্রিৎস্ ম্যাকলাপ (Fritz Machlup), গ্যারি বেকার (Gary S Becker), জন কেনেথ গলব্রেথ (John Kenneth Galbraith), রবার্ট সলো (Robert T Solow) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ বেশি করে জোর দিয়েছেন অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপরে। তাঁরা দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যের দেশগুলি উনিশ বা বিশ শতকে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য

যন্ত্রপাতি, পুঁজি ও শ্রমের জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করেছে শুধু সে সবের প্রভাব থেকে এসব দেশে উৎপাদন শক্তির বিপুল বিকাশকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না; এক্ষেত্রে বাড়তি যে অদৃশ্য বিনিয়োগের প্রভাব যোগ হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ; পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে এদের অবদান রীতিমতো বড় মাপের। তেমনি এসব দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের; বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে অবদান রাখে তা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের চাইতেও বেশি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৫৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে হিসেব করে শুলজ্ দেখিয়েছেন, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিনিয়োগের ওপর বার্ষিক যে মুনাফা পাওয়া যায় তা এধরনের : প্রাথমিক স্তরে ৩৫ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ১০ শতাংশ, আর কলেজ স্তরে ১১ শতাংশ। সাম্প্রতিককালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদ্যোগে জর্জ সাখারাপৌলাস (George Psacharapoulos) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ পৃথিবীর নানা দেশ সম্পর্কে এধরনের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে মোটামুটি একই রকম ফলাফল পেয়েছেন। এসব গবেষণা অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারক হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়নের ভূমিকাকেই বড় করে তুলে ধরেছে।

পাশ্চাত্যের বিকাশ ও উদ্ভাবন

উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি কাজে লাগিয়ে কিভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে জনগণের জীবনমানে বিপুল পরিবর্তন আনা সম্ভব হল তা নিয়ে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে এমন কি আঠারো শতকের শেষ দিকেও পশ্চিম ইউরোপের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানে তৎকালীন ভারত বা অন্য দেশের চেয়ে এমন বিরাট কিছু পার্থক্য আসে নি। উনিশ শতকের শুরু থেকে পশ্চিম ইউরোপে কল-কারখানার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, যাকে সচরাচর বলা হয় শিল্প-বিপ্লব— এবং তার ফলে পশ্চিমের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানে বিপুল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। গত দু'শ বছরে এসব দেশে শিশুমৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে কমেছে, গড় প্রত্যাশিত আয়ু দ্বিগুণ হয়েছে, মাথাপিছু আয় অন্তত দশগুণ বেড়েছে। আগে যেখানে অনেক দেশে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকত শুধু খাদ্য উৎপাদনে, সেখানে এখন ৫ শতাংশের কম লোক নিয়োজিত ফসল উৎপাদনে।

স্বভাবতই, এর মধ্যে কোন কোন দেশ নিছক ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমেই তাদের প্রাথমিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি এসব দেশের দৃষ্টান্ত এখানে আনা যায়। আবার কোন কোন দেশের নিজেরই ছিল যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ; যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা। কিন্তু এসব যুক্তি সব দেশের বেলায় ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা শক্ত হয়ে ওঠে। নরওয়ে বা সুইজারল্যান্ড কখনও সাম্রাজ্য বিস্তার করে নি; স্পেন এবং পর্তুগাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেও তেমন স্থায়ী

সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয় নি। জাপানের তেমন বড় আকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না। শেষ বিচারে দেখা যাবে পাশ্চাত্যের এই সমৃদ্ধি লাভের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে উদ্ভাবন, শিক্ষার বিস্তার এবং এসব দেশের উদ্ভাবনশীল মানুষদের নিরন্তর শ্রম।

পনের, ষোল বা সতের শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল অনেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে; কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রমুখ এভাবেই তাঁদের অসাধারণ উদ্ভাবনমূলক কাজ করেছিলেন। তাঁরা তেমন কোন সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পান নি। এসময়ে প্রযুক্তির বিকাশও ঘটছিল অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে, ব্যক্তি-উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে। বিজ্ঞান থেকেই প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটছিল বা প্রযুক্তি থেকে বিজ্ঞানের— এমন বলা যাবে না। এমন কি উনিশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লবের প্রথমদিকেও বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ ঘটছিল মূলত সমান্তরাল ধারায়। শিল্প-কারখানায় প্রযুক্তিবিদ আর কারিগররা তাঁদের উদ্ভাবনশীলতা প্রয়োগ করছিলেন অনেকটা স্বাধীনভাবে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির চেয়ে তাতে বেশি ভূমিকা রাখছিল তাঁদের কুশলতা, শ্রম আর নিষ্ঠা।

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির মেলবন্ধন সুদৃঢ় হতে শুরু করে। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগ দেন শিল্প-উদ্যোক্তারা; শুরু হয় বিজ্ঞানী আর শিল্প-উদ্যোক্তাদের মিলিত এবং সংগঠিত উদ্যোগ। এই ধারা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে শিল্পপতিরা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের জন্য বিজ্ঞানীদের জন্য বিপুলাকার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন।

বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ধারায় একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে তাঁদের মধ্যে তথ্য ও ভাবের আদান-প্রদান; এমনি ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বিজ্ঞানীদের প্রথম সংগঠন গড়ে ওঠে অবশ্য সতের শতকেই। লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬০ সালে। আইজাক নিউটন দীর্ঘকাল ছিলেন এর সভাপতি। সতের এবং আঠারো শতকে ইউরোপ-আমেরিকায় এধরনের আরো অনেকগুলো সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এসব সংস্থার পক্ষ থেকে বিজ্ঞানীদের নানা আবিষ্কারের বিবরণ দিয়ে অনেকগুলো বিজ্ঞান-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন আবিষ্কারের খবরাখবর অন্য বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে দেয়া, সেসবের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং গবেষণার জন্য নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

অবশ্য প্রথমদিকে গবেষণাকর্ম বিজ্ঞানীদের জন্য মোটেই তেমন কোন অর্থকরী সুবিধা এনে দিতে পারে নি। গবেষণার বা প্রকাশনার সমঝদার ছিল সমাজে খুবই কম; তাই এধরনের কাজ বিজ্ঞানীদের জীবিকা অর্জনে তেমন সহায়ক হয় নি। আর এজন্যই আইজাক নিউটনের মতো অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানীকেও গির্জার মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পদের বদলে টাকশালের তত্ত্বাবধায়কের পদ গ্রহণ করতে হয়।

বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত উদ্যোগে গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রথম সংগঠিত চেষ্টা

দেখা দেয় উনিশ শতকের শুরুতে। রয়্যাল সোসাইটির কয়েকজন ফেলোর উদ্যোগে ১৭৯৯ সালে দ্য রয়্যাল ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই ইন্সটিটিউশনে একটি গবেষণাগার স্থাপন করা হয় যেখানে বিজ্ঞানীরা স্বাধীনভাবে গবেষণা চালাতে এবং শিক্ষকতা করতে পারতেন। এখানেই মাইকেল ফ্যারাডে সারা জীবন তাঁর গবেষণা চালান এবং বিদ্যুৎচুম্বকীয় আবেশের মতো ঐতিহাসিক আবিষ্কার করেছিলেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপ-আমেরিকায় এধরনের আরো বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সংস্থা গড়ে ওঠে। আমেরিকার স্বনামখ্যাত এম.আই.টি. (ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৫ সালে। অনেকটা এসময় থেকেই প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের ব্যাপক বিকাশের ফলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিভাগে ভাগ হয়ে যেতে আরম্ভ করে।

বিজ্ঞানের গবেষণার একটি প্রধান চরিত্র এসব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে থাকে। সে হল পর্যবেক্ষণ, যাচাই, যুক্তি, পরীক্ষণ এবং পুনঃপরীক্ষণের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের সত্য উদ্ঘাটনের পদ্ধতি আর এই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ঘাটিত সত্যের একটা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা। ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমগ্র জনসমাজে এই উপলব্ধি সঞ্চারিত হতে থাকে যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলো অনেকটা সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য এবং এসব আবিষ্কার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। তার ফলে ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানী সমাজেরও একটা গ্রহণযোগ্যতা জন্মায়।

বিজ্ঞানীরা শুধু প্রকৃতির নানা রহস্য উদ্ঘাটন করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তাঁরা সেগুলো মানুষের নানা দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিগুলো অনেক ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত সমস্যার দ্রুত সমাধানে সহায়তা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কৃষিকাজে ব্যবহৃত লাঙ্গলের ফলার দক্ষতা বহুগুণে বেড়ে যায়। তেমনি কংক্রিটের ব্যবহার মানুষ জানত প্রায় দু'হাজার বছর আগে থেকেই, কিন্তু উনিশ শতকে রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে যখন দেখা গেল তার গুণাগুণ নাটকীয়ভাবে বাড়ানো যায় তখনই নির্মাণকাজে কংক্রিটের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। কংক্রিটের ব্যবহার বড় বড় সেতু ও ভবন নির্মাণে সহায়তা করে নগরায়ণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

উনিশ শতকের শেষদিকে জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন নতুন রাসায়নিক বস্তু উৎপাদনের জন্য শিল্প-গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। ১৮৫৬ সালে ইংরেজ রসায়নবিদ পার্কিন (William Henry Perkin) আলকাতরা থেকে প্রথম অ্যানিলিন রঙ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পরের বছর এই রঙ তৈরির জন্য তিনি একটি কারখানা স্থাপন করেন। এ থেকেই সূত্রপাত হয় বড় আকারের রাসায়নিক শিল্পের। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে জার্মানিতে অনেকগুলো গবেষণাগারে রসায়নের এই ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সমন্বিত গবেষণা শুরু

হয়; তাতে এই শিল্প সত্যিকার পরিণত রূপ লাভ করে।

জার্মানিতে এসব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে ১৮৯২ সালে আমেরিকায় জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি তাদের নিজস্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে। বিশ শতকের প্রথমভাগে আমেরিকায় বেসরকারি উদ্যোগে এধরনের আরো অনেকগুলি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়; পরবর্তীকালে এসব প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি জ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম প্রথম নব্য উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এগোতে হয়েছে; কখনও কখনও অনেক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু এভাবে ঠেকে ঠেকে শিখে তারা অবশেষে সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া এধরনের সাফল্য সব সময় যে শুধু বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই জুটেছে তা নয়, কখনও কখনও ছোটখাট নতুন প্রতিষ্ঠানও তাদের অসাধারণ উদ্ভাবনমূলক কাজের ফলে বড় প্রতিষ্ঠানকে পেছনে ফেলে গিয়েছে। সাম্প্রতিককালে ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রেও এমন বেশ কতকগুলো দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

অবশ্য উদ্ভাবনমূলক কাজ যে কেবল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ঘটছে তা নয়; অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই গবেষণা ও নতুন শিল্প-উদ্যোক্তাদের সহায়তার প্রধান দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। এমন কি উন্নত দেশগুলিতেও বিজ্ঞান গবেষণা আজ এমন ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, গবেষণার ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে ক্রমেই বেশি করে দায় গ্রহণ করতে হচ্ছে।

পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির এই বিবরণ থেকে দেখা যায়, এর মূলে একদিকে যেমন রয়েছে সমগ্র জনসমাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে উপলব্ধির বিস্তার, তেমনি রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের সফলতা। এই যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য যা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে তা হল যথোপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা আর সামাজিক সংগঠন। তা যদি না থাকে তাহলে কোন উন্নয়নশীল দেশ পাশ্চাত্যের কাছ থেকে উন্নত বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি ধার করে নিয়ে এলেও তা থেকে যথাযথ ফল পাওয়া তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

প্রাচ্যের বাঘদের অভিজ্ঞতা

অতি সাম্প্রতিককালে প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। তাদের কখনো কখনো বলা হয় 'দ্য এশিয়ান টাইগার্স' বা এশিয়ার বাঘ। এদের মধ্যে প্রথম পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যায় জাপান, তারপর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে হংকং, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যাণ্ড। বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি সাম্প্রতিক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে ১৯৬৫-৯০ সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১.৯ শতাংশ, সেখানে এই ক'টি দেশের গড় প্রবৃদ্ধির হার হয় ৫.৬ শতাংশ অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় প্রায় তিনগুণ

বেশি। গত পঁচিশ বছরে এদের মধ্যে প্রথম চারটি দেশে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বেড়েছে চারগুণের ওপরে, আর শেষের তিনটি দেশে বেড়েছে দু'গুণের ওপরে। এদিক থেকে এই দেশগুলির অগ্রগতির হার পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির চেয়েও বেশি। (The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. A World Bank Policy and Research Report. Oxford University Press, 1993, p. 2)।

এই দেশগুলির এমন নাটকীয় অগ্রগতি সারা দুনিয়ার অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ আর কৌতূহলের সঞ্চার করেছে। তাঁরা নানা ধরনের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখেছেন এদের এই অগ্রগতির মূলে প্রধান যে জিনিসটি কাজ করেছে সে হল মানব সম্পদের উন্নয়ন। দীর্ঘকাল ধরে এই দেশগুলি মানব সম্পদ উন্নয়নে, বিশেষ করে সর্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারে যে পরিমাণ উদ্যোগ নিয়েছে দুনিয়ার আর খুব কম উন্নয়নশীল দেশেই তা ঘটেছে। তাছাড়া এসব দেশের সরকার প্রয়োগমুখী গবেষণার জন্যও প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

সারণি ১ : কয়েকটি এশীয় দেশে বয়োক্রমভিত্তিক শিক্ষার্থীর শতকরা হার

দেশ	প্রাথমিক		মাধ্যমিক		উচ্চ শিক্ষা	
	১৯৭০	১৯৯২	১৯৭০	১৯৯২	১৯৮০	১৯৯২
জাপান	৯৯	১০২	৮৬	৯৭	৩১	৩২
সিঙ্গাপুর	১০৫	১০৭	৪৬	৭০	৮	৮
হংকং	১১৭	১০৮	৩৬	তথ্য নেই	১১	২০
কোরিয়া	১০৩	১০৫	৪২	৯০	১৬	৪২
মালয়েশিয়া	৮৭	৯৩	৩৪	৫৮	৪	৭
থাইল্যান্ড	৮৩	৯৭	১৭	৩৩	১৩	১৯
ফিলিপাইন	১০৮	১০৯	৪৬	৭৪	২৮	২৮
ইন্দোনেশিয়া	৮০	১১৫	১৬	৩৮	৪	১০
শ্রীলঙ্কা	৯৯	১০৭	৪৭	৭৪	৩	৬
ভারত	৭৩	১০২	২৬	৪৪	৬	তথ্য নেই
বাংলাদেশ	৫৪	৭৭	তথ্য নেই	১৯	৩	৪

তথ্যসূত্র : বিশ্বব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯৫।

জাপানে ১৮৬৮ সালে মেইজি সংস্কারের ফলে সামন্তবাদের অবসান সূচিত হয়। সেই সঙ্গে শুরু হয় দেশের এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কাজ। এই আধুনিকীকরণের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা হয় এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, যা অর্থনীতির আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টি করবে এবং জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত করবে। ১৮৭১ সালে একটি জাতীয় শিক্ষা দপ্তর স্থাপন করা হয় এবং তার পরের বছর এই শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে 'গাকুসাই' নামে একটি

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। একই সঙ্গে চালু হয় একটি ব্যাপক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রকল্প এবং তার কিছুদিন পরই ১৮৭২ সাল থেকে সারা দেশে চার বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়।

জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এশিয়ার নব্য উন্নত সব দেশেও প্রথমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং তারপর দ্রুত সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া এসব দেশের শিক্ষাসূচিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এসব দেশে শিক্ষাক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে সারণি ১ থেকে।

সারণিতে দেখা যাবে যে, এসব দেশের মধ্যে যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সফল হয়েছে তাদের প্রায় সবারই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর হার বয়োক্রমের শতকরা ১০০ ভাগ বা তার বেশি (১০০ ভাগের বেশি হবার অর্থ ঐ স্তরে যে-বয়সীদের পড়বার কথা তাদের বেশি বা কম বয়সীও কিছু বিদ্যালয়ে রয়েছে)। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরেও সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বয়োক্রমের ৬০ শতাংশ বা তার বেশি। বলা বাহুল্য বাংলাদেশ এসব লক্ষ্য অর্জন থেকে এখনও অনেক দূরে রয়েছে।

এসব উন্নত এশীয় দেশগুলির সাফল্যের আর একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে মোট জাতীয় আয়ের অনুপাতে শিক্ষার জন্য তাদের ব্যয় যেমন উচ্চ তেমনি এই ব্যয়ের সিংহভাগ তারা নিয়োগ করে বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে। ১৯৮৫ সালে হংকং তার শিক্ষা বাজেটের ৬৯.৩ শতাংশ ব্যয় করে বুনিয়াদি শিক্ষায়; ইন্দোনেশিয়ায় এই হার ছিল ৮৯.০ শতাংশ, কোরিয়ায় ৮৩.৯ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৭৪.৯ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে ৬৪.৬ শতাংশ, আর থাইল্যান্ডে ৮১.৩ শতাংশ। (*The East Asian Miracle*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯)

বাংলাদেশে উন্নয়নের সমস্যা

এটা সবারই জানা যে, বাংলাদেশে দারিদ্র সর্বব্যাপী। এদেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় গড়ে মাত্র ২২০ ডলার, আর দেশে এযাবৎ তেমন কোন খনিজ সম্পদ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। আজ থেকে মোটামুটি দু'শ-আড়াইশ' বছর আগে, অর্থাৎ ইংরেজদের আবির্ভাবের সময়ে, এদেশ দুনিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিবেচিত হত; কিন্তু আজ বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলির অন্যতম। আরো বেশি করে উদ্বেগজনক ব্যাপার হল, বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার দীর্ঘকাল ধরে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ন কর্মসূচির একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

> সম্পদের অপ্রতুলতা, বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে, ক্রমেই বেশি করে প্রকট হয়ে উঠছে। ... প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ জনশক্তি কোন উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত নয়। দক্ষতা ও সাক্ষরতার রয়েছে দারুণ অভাব। ... প্রায় অর্ধেকসংখ্যক পরিবার তাদের নিম্নতম দৈনন্দিন খরচ মেটাতে পারে না। গত ২০ বছরের মধ্যে এ অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি এবং এর প্রভাব

পড়ছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে। *(Human Development in Bangladesh*. Dhaka : UNDP. 1992, pp. 44-45)

এই একই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যাদের প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম বাংলাদেশ তাদের দলে পড়ে। ১৯৬৫-৯০ সময়সীমায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.৭ শতাংশ, যেখানে ভারতের ছিল ১.৯ শতাংশ, পাকিস্তানের ২.৫ শতাংশ, মালয়েশিয়ার ৪.০ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ৪.৪ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৪.৫ শতাংশ এবং চীনের ৫.৮ শতাংশ। বাংলাদেশে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু মাত্র ৫২ বছর, আর বাংলাদেশ দুনিয়ার মাত্র তিনটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে পুরুষদের গড় আয়ু মেয়েদের তুলনায় বেশি। এদেশে গড়ে পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটি মারা যায় পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই; এই শিশু মৃত্যুর হার দুনিয়ার ১০৬টি দেশের ওপরে। বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ১৯৩৭ সালে ছিল ২,৭৪৩ কিন্তু ১৯৮৬ সালে তা থেকে কমে হয়েছে মাত্র ১,৯২৭; এই কমার ধারা এখনও অব্যাহত আছে। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক রয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে, কাজেই তাদের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ স্বভাবতই এই গড় হারের চেয়েও কম।

এমন সম্পদের অভাবের দেশে, স্বভাবতই জনগণের চরম দারিদ্রের লাঘব করাই হল এদেশের অগ্রগতির প্রধান সমস্যা আর এক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এবং উদ্ভাবকদের প্রধান ভূমিকা থাকবার কথা। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এজন্য একটি জরুরি প্রয়োজন হল সমগ্র জনগণের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষার বিস্তার। বাংলাদেশে মোট বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ লিখতে পড়তে পারে না। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সরকারি হিসেবে ৯০ শতাংশ স্কুলে যাবার সুযোগ পায়, তবে তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ প্রাথমিক স্কুল শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এদেশে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য আট বছর মেয়াদি বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দেশের বিপুলসংখ্যক বয়স্ক মানুষের জন্যও চাই উপানুষ্ঠানিক বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা। এই বুনিয়াদি শিক্ষায় ভাষা সাক্ষরতা ও গণিত সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত সাক্ষরতাও সব মানুষের কাছে লভ্য করে তুলতে হবে।

এদেশে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা স্তরে আজ যে বিজ্ঞান শেখানো হয় সে অতি নামমাত্র। তার বিস্তার ও মান নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীর হার আশঙ্কাজনকভাবে নেমে যাচ্ছে। আশির দশকের শেষদিকে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর হার বাড়ার ফলে ১৯৯১ সালের শেষ পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী হয়েছিল ৪৪ শতাংশ ; অথচ ১৯৯৫ সালে

এই হার নেমে মাত্র ২৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আজ যখন সমগ্র পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আরো দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলেছে তখন বাংলাদেশে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বিজ্ঞানবিমুখ প্রবণতা দেশের ভবিষ্যতের জন্য কোন আশার বাণী বহন করে না।

বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক ১৯৮৬ সালে ঘোষিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় মোট জাতীয় আয়ের অন্তত এক শতাংশ বরাদ্দ করার কথা রয়েছে ; কিন্তু বাস্তবে সেক্ষেত্রে বরাদ্দ হয় ০.১ শতাংশেরও কম। দেশে যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়, কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তার খুব কম অংশই বাস্তবে ব্যবহারিক কাজে লাগানো হচ্ছে। আসলে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ভূমিকা নিয়ে আমাদের আজ গভীরভাবে ভেবে দেখার এবং আজকের এই চরম অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এসেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির মহাসরণি আর কতদূর

"বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির মহাসরণিতে প্রবেশ করছে।" — পত্রিকার বিশাল হেডলাইন জানিয়ে দিচ্ছে এই সুসংবাদ। সারা পৃথিবীর তাবৎ তথ্য এবার থেকে হাজির হবে আমাদের হাতের মুঠোয়। আর এখন থেকে দুনিয়া জোড়া অর্থনীতি, বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংবাদ আর সংস্কৃতির ধারায় সম্পৃক্ত হবে বাংলাদেশের মানুষ।

আসলে হয়তো ব্যাপারটা তেমন নাটকীয় নয় ; কোন একটি প্রতিষ্ঠান হয়তো যোগ দিয়েছে বিশ্বব্যাপী 'ইন্টারনেট' তথ্যসংযোগ ব্যবস্থায়। এমন সংযোগ বাংলাদেশে এর মধ্যে ঘটেছে 'কয়েকশ' প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কম্পিউটারের। তার কিছু ঘটেছে চার-পাঁচটি বাণিজ্যিক সংযোগ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, কিছু-বা পৃথকভাবে।

কিন্তু এই সংখ্যাটিকে যদি তুলনা করি সারা পৃথিবীর হিসেবের সঙ্গে তাহলে মনে হবে বাংলাদেশে এখনও তথ্যপ্রযুক্তি সংযোগের তেমন কিছুই ঘটে নি। তথ্যপ্রযুক্তির মহাসরণিতে গত এক দশকের মধ্যে যুক্ত হয়েছে সারা পৃথিবীর ১৬০টি দেশের অন্তত চার কোটি মানুষ; আর প্রতি বছর এই সংখ্যাটি মোটামুটি দ্বিগুণ হচ্ছে। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্য মার্কিন মুলুকের সংখ্যাই অর্ধেকের ওপরে; কেননা সেদেশে এক-তৃতীয়াংশ পরিবারে আজ রয়েছে কম্পিউটার, অফিসে আর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও আছে অধিকাংশ কর্মীর জন্য। সে দেশে যে দশ কোটি লোক আজ কম্পিউটার ব্যবহার করে তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই যোগ দিয়েছে ইন্টারনেট সংযোগে।

কিন্তু অবস্থা আজ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ইউরোপ আর পূর্ব এশিয়ার নব্য বাঘেরা আমেরিকাকে অল্পদিনের মধ্যে ধরে ফেলার উপক্রম করছে। বলা হচ্ছে এই শতাব্দী শেষ হতে হতে পৃথিবীতে তথ্য মহাসরণিতে যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে হবে আজকের চেয়ে অন্তত দশগুণ। শুধু বাংলাদেশের মতো কিছু উন্নয়নশীল দেশই এখনও কেবল এই মহাসরণির প্রান্ত ছোঁবার চেষ্টা করছে।

তথ্য মহাসরণির ভিত

তথ্যপ্রযুক্তির মহাসরণি কথাটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯৯২ সালের শুরুতে; বলেছিলেন সে সময়ে নবনির্বাচিত মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি অ্যাল গোর। তাঁর চালু করা সেই Information Superhighway বা 'তথ্যের মহাসরণি' কথাটি আজ সারা দুনিয়ায় চালু হয়ে গিয়েছে। আধুনিক কালের তথ্য বিপ্লবের সবচেয়ে জাজ্বল্যমান

প্রতীকের অন্য আরো কিছু নামকরণের চেষ্টা কেউ কেউ করেছেন— যেমন 'ইনফরমেশন হাইওয়ে' (তথ্যের রাজপথ), 'ইলেকট্রনিক সুপারহাইওয়ে', 'ডাটা হাইওয়ে', ইত্যাদি ; কিন্তু সেসব তেমন চলে নি।

তথ্যের মহাসরণি নামটি চালু হয়ে গেলেও রাজপথটি কি এর মধ্যে সত্যি সত্যি চালু হয়েছে? —এর উত্তরে আজ হ্যাঁও বলা যায় আবার না-ও বলা যায়। আরো খুলে বললে বলতে হয়, হ্যাঁ, চালু হয়েছে, তবে আংশিকভাবে। দুনিয়ার প্রায় সব দেশ মিলে মোটামুটি চার কোটি কম্পিউটার ব্যবহারকারী একে কাজে লাগাচ্ছে। সব দেশ যে এর সুবিধে সমানভাবে নিতে পারছে তা অবশ্য নয়। যেমন বাংলাদেশে কম্পিউটার ব্যবহার এখনও একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়, তাই আমরা এই রাজপথে কেবল পা রাখার উপক্রম করছি।

তবে আজ এটা খুব স্পষ্ট যে, প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে শিগ্গিরই দুনিয়া জুড়ে তথ্যের বিপুল আদান-প্রদান শুরু হবে। যে দেশ যত বেশি তথ্য যত দ্রুত আয়ত্ত করতে পারবে তার হাতে আসবে তত বেশি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শক্তি। সেজন্য আমেরিকাকে প্রস্তুত করার স্বপ্ন নিয়েই অ্যাল গোর মূলত তথ্যের মহাসরণি নামকরণটি করেছিলেন। তার জন্য বিপুল গতিতে আমেরিকায় নতুন যন্ত্রপাতি (প্রধানত তামার তারের বদলে তার চাইতে অনেক ব্যয়বহুল তবে তথ্য আদান-প্রদানে বহু সহস্রগুণে দক্ষ কাচতন্তুর কেব্‌ল) বসানোর কাজ চলছে। অন্যান্য উন্নত দেশও আজ আর পিছিয়ে নেই। তার ফলে এই শতাব্দীতে না হলেও আগামী শতাব্দীর শুরুতে যে আমরা তথ্যপ্রযুক্তির প্রশস্ত মহাসরণি পুরোপুরি চালু হতে দেখব তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই মহাসরণি দুনিয়ার রাজনীতি-অর্থনীতিতে কতখানি প্রভাব ফেলবে? বাংলাদেশের অগ্রগতিতেই-বা এই মহাসরণির প্রভাব কতখানি পড়বে? —এসব কথা আমাদের আজই ভেবে দেখার সময় এসেছে।

মানুষের সভ্যতার একটি প্রধান উপকরণই হল তথ্য। মানুষের সকল অভিজ্ঞতা, সকল চিন্তা আর উদ্ভাবনের প্রকাশ ঘটে তথ্যের আকারে। এই তথ্য বিস্তারের একটি শক্তিশালী উপায় আবিষ্কৃত হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে, ছাপাখানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে। অনেক দূরে আর অতি দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এক বিস্ময়কর উপায় আবিষ্কৃত হল আজ থেকে একশ' বছরের একটু বেশি আগে — আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল-এর টেলিফোন আবিষ্কারের মাধ্যমে। শব্দের সামান্য ওঠানামা পরিণত হল বিদ্যুৎ সঙ্কেতের ওঠানামায়, তারপর তামার তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে তা আবার পরিণত হল শব্দের সঙ্কেতে। দেখতে দেখতে টেলিফোনের বার্তা বিনিময়ের জন্য দেশে দেশে বসানো হল তামার তারের কেব্‌ল। বিশাল সব সাগর-মহাসাগরের তলা দিয়ে চলে গেল সে সব কেব্‌ল। তারপর অগ্রগতির প্রবাহ আরো এগিয়ে চলল। এলো বিনা তারে যোগাযোগ। টেলিফোনের সঙ্গে ঘটল বেতারের মেলবন্ধন।

কিন্তু অগ্রগতি সেখানেই থেমে থাকল না। বিশ শতকের মাঝামাঝি খুব

অল্পদিনের ব্যবধানে বিস্ময়কর চলন্ত ছবি নিয়ে এলো টেলিভিশন, দূর দেশে তাৎক্ষণিক বেতার যোগাযোগের জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ, তারপর অসাধারণ শক্তিধর সব কম্পিউটার। তথ্যের সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ আর বিস্তার ঘটাবার ক্ষেত্রে দেখা দিল নতুন নতুন বৈপ্লবিক সম্ভাবনা। তারপর টেলিভিশনের সঙ্গে উপগ্রহ যোগাযোগের, আর তার সঙ্গে কম্পিউটারের যোগ ঘটতে বেশি দেরি হল না। তার ফলে সারা পৃথিবী আজ তথ্যপ্রযুক্তির এক বিশাল জালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে। দুনিয়ার যে-কোন দেশে ঘরে বসে বি.বি.সি., সি.এন.এন. প্রভৃতির কল্যাণে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে দেখছে বহুদূর দেশের সমসাময়িক ঘটনা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দৃশ্য। আমাদের দেশেও মাত্র গত তিন-চার বছরের মধ্যে ডিশ অ্যান্টেনা আর কেব্‌ল্‌ টেলিভিশনের বদৌলতে এসব অনুষ্ঠান লভ্য হয়ে উঠেছে দেশের নানা দূর প্রান্তে।

আশির দশকের শুরুতে ছোট আকারের ডেস্কটপ কম্পিউটারের উদ্ভব ঘটায় কম্পিউটার লভ্য হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের কাছে। এক কম্পিউটারের সঙ্গে যোগ হতে লাগল অন্য কম্পিউটার। কম্পিউটারে কম্পিউটারে অতি দ্রুত ঘটতে লাগল তথ্যের আদান-প্রদান। আর তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারে আজ লেগেছে গণতন্ত্রের ছোঁয়া। তৈরি হয়েছে তথ্য মহাসরণির ভিত।

বিশাল জালের সমাহার

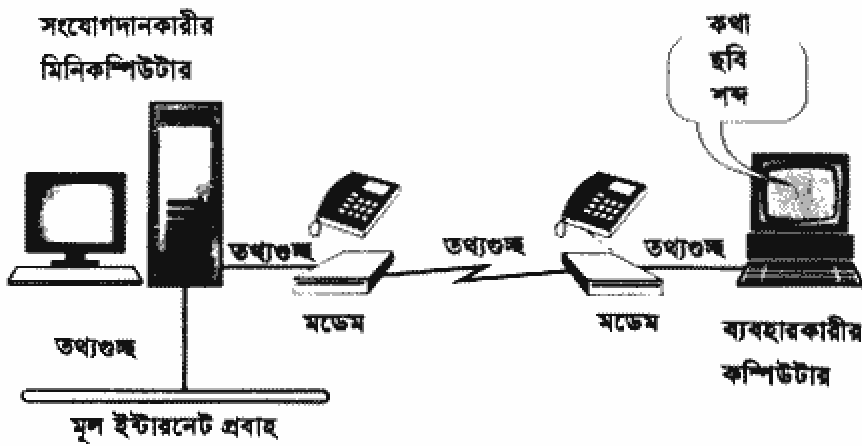
কম্পিউটার এই শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কৃত হলেও প্রথমদিকে তার আকার ছিল বিশাল, দামও ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। সত্তরের দশকে কম্পিউটারের আকার কিছুটা ছোট হতে আরম্ভ করে। আর সেই তখনই বোঝা যায় একটি কম্পিউটার দিয়ে যতটা কাজ করা যায়, কয়েকটি কম্পিউটারের সংযোগ ঘটালে তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করা সম্ভব হয়। প্রথম প্রথম এই সংযোগ ঘটল শুধু একটি অফিস বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে; তাতে কম্পিউটারের শক্তি এবং কার্যক্ষমতা বেশ কিছুটা বাড়ল। ক্রমে ক্রমে এমনি সংযোগ একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তারপর সত্তর আর আশির দশক জুড়ে কম্পিউটারের আকার ক্রমাগত ছোট হতে লাগল, সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তার শক্তি আর হু-হু করে কমতে লাগল দাম। কম্পিউটার দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল অফিসে, কল-কারখানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মানুষের ঘরবাড়িতে।

ষাটের দশকের শেষদিকেই মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে মনে হয়েছিল পারমাণবিক যুদ্ধ যদি সত্যি সত্যি শুরু হয় তাহলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে পড়তে পারে; আর তাহলে যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত হবে। এমন অবস্থা যেন না ঘটে তার জন্য বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলোর মধ্যে একটা নির্ভরযোগ্য আর স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। ১৯৬৯ সালে মার্কিন দেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্য নিয়ে 'আর্পানেট' নামে এই সংযোগটি গড়ে ওঠে (ARPA অংশটি প্রতিরক্ষা বিভাগের Advanced Research Project Agency-র আদ্যক্ষর নিয়ে তৈরি)।

ক্রমে ক্রমে এই সংযোগ জাল আরো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আশির দশকের শেষে দেখা গেল এই সংযোগ জালটি নিছক সামরিক গবেষণা ছাড়িয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের গবেষকদের মধ্যে, এমন কি মার্কিন মুলুকের বাইরে বিভিন্ন দেশের গবেষণা সংস্থাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই তথ্যজালের কোন নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা ছিল না; অনেকগুলো সহযোগী সংস্থার স্বেচ্ছা সংযোগের ভিত্তিতে এই জালটি গড়ে ওঠে। আর জালটি এমনভাবে তৈরি হয় যেন যুদ্ধকালে তার যে-কোন একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গেলেও অন্য অংশগুলো পরস্পর সংযোগের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ক্রমে ক্রমে একটি 'নেট' বা জালের সঙ্গে যোগ হয় অন্য জালের; এভাবে অনেক জালের সমাহারে আজ একটি আন্তর্জাতিক জাল গড়ে উঠেছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্টারনেট'।

প্রথমদিকে টেলিফোন যোগাযোগের জন্য দেশে দেশে যে তারের সংযোগ গড়ে উঠেছিল তাই ছিল ইন্টারনেটের ভিত্তি; তারপর এর সঙ্গে যুক্ত হল কৃত্রিম উপগ্রহের যোগাযোগ। নানা দেশে অনেকগুলো কেন্দ্রের মাধ্যমে অনেকগুলো জাল যুক্ত হবার ফলে ইন্টারনেট আজ হয়ে উঠেছে এক বিশ্বজোড়া জাল। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই জাল লভ্য হয়ে উঠেছে সব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে। তার ফলে আজ দুনিয়ার যে-কোনো দেশের একজন মানুষ ঘরে বসে তার কম্পিউটারের মাধ্যমে অন্য দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি থেকে বিশাল তথ্য ভাণ্ডার ব্যবহার করতে পারে। বিজ্ঞানী আর বিশেষজ্ঞদের গবেষণার জন্য এর ফলে খুলে গেছে এক সুবর্ণ সুযোগ। এমন সুযোগ এর আগে গবেষকরা আর কখনোই পান নি। নিজের বিষয়ের এলাকায় এর আগে কি ধরনের গবেষণা হয়েছে বা এখন কি ধরনের গবেষণা কোথায় চলছে তার হদিস করার জন্য আগে গবেষকদের দিনের পর দিন নানা লাইব্রেরিতে বসে প্রাণান্তকর খোঁজাখুঁজি করতে হত। অথচ এখন দুনিয়ার সব বড় বড় গ্রন্থাগারের বই আর পত্র-পত্রিকার সব তথ্য কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে নানা বিষয়ভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশে; আর তা থেকে দুনিয়ার যে-কোন প্রান্তের গবেষকরা ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে উদ্ধার করে নিতে পারছেন সে তথ্য।

গোড়ায় যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল প্রধানত বিজ্ঞানী আর গবেষকদের ব্যবহারের জন্য তা আর বেশি দিন শুধু তাদের ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। মার্কিন মুলুকে এবং অন্যান্য দেশে ব্যবসায়ীরা দেখল সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে তথ্য যোগাযোগের বিপুল চাহিদা; অর্থাৎ এতে আছে দুনিয়া জোড়া এক বিরাট ব্যবসার সুযোগ। তাদের উদ্যোগে দুনিয়ার দেশে দেশে গড়ে উঠতে লাগল ইন্টারনেটের অসংখ্য কেন্দ্র; এমনি একেকটি কেন্দ্রে থাকল একটি বেশ শক্তিশালী কম্পিউটার আর তার সঙ্গে যোগাযোগ হল বেশ কিছু ব্যবহারকারীর। অর্থাৎ তার চারপাশে তৈরি হল নতুন নতুন যোগাযোগের জাল, আর ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ফলে সে সব জাল যুক্ত হতে লাগল একে অন্যের সঙ্গে। আর এমনি সব পরস্পর সংযুক্ত জালের মাধ্যমে কম্পিউটারের দূতিয়ালিতে দুনিয়ার এক



মূল ইন্টারনেট প্রবাহ থেকে ব্যবহারকারীর ইন্টারনেট সংযোগব্যবস্থার নকশা

প্রান্তের অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হয়ে উঠল।

এসব যোগাযোগ প্রধানত শুরু হল বিশেষ বিশেষ আগ্রহের বিষয়কে কেন্দ্র করে। যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবেশ, মানবাধিকার এমনি নানা বিষয়ে আগ্রহীদের পৃথক পৃথক গোষ্ঠী গড়ে উঠল। প্রতি মাসে ইন্টারনেট যোগাযোগের সংখ্যা বাড়তে লাগল প্রায় বিশ শতাংশ হারে। অর্থাৎ প্রতি পাঁচ মাসে ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠল। এভাবে দেখতে দেখতে গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীতে যোগাযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ, ব্যবহারকারীর সংখ্যা উঠেছে প্রায় চার কোটিতে; আর এখনও এই সংখ্যার বৃদ্ধি থেমে যাবার কোন লক্ষণ নেই, বরং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অতি দ্রুত হারে বেড়েই চলেছে।

বিশেষ আগ্রহের বিষয়কে অবলম্বন করে একটি গ্রুপের সদস্যরা (যারা হতে পারে দুনিয়ার নানা প্রান্তের নানা দেশের) পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে। কেউ কোন সমস্যার সমাধান চাইতে পারে অন্য সদস্যদের কাছে; সেক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্য প্রান্তের কারো কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়তে পারে কোন অপ্রত্যাশিত সমাধান। কেউ কোন খবর পাঠাতে পারে তাদের গ্রুপের সব সদস্যের কাছে; এমনি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হতে পারে বহু লক্ষ। খবর পাঠানো যায় নির্দিষ্ট গ্রুপের বাইরে অন্যদের কাছেও। ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে মস্কোতে যখন সরকারি সেনাবাহিনী পার্লামেন্ট ভবনের ওপর গোলা ছুঁড়তে শুরু করে তখন সে খবর বাইরের দুনিয়ায় প্রথম এসে পৌঁছয় ইন্টারনেটের মাধ্যমেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায় বিপুল সব তথ্য সন্নিবেশ থেকে দুষ্প্রাপ্য নানা তথ্য; দেখা যায় পছন্দমতো ছায়াছবি; ই-মেইল (বা ইলেকট্রনিক মেইল)-এর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাঠানো যায় খবর বা ছবি; তেমনি অন্যের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে বার্তা অথবা ছবি।

ধরা যাক কেউ ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন খবর বা ছবি বা আর কিছু পাঠাতে চায়

দূরের কোন কম্পিউটারে। এমনি বার্তাকে কম্পিউটার প্রথমে ভাগ করে ফেলে অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ডে; তারপর এসব খণ্ডকে পাঠিয়ে দেয় গন্তব্য পথে। এই খণ্ডগুলি আন্তর্জাতিক তথ্য সড়কের পথ বেয়ে যেদিকে ফাঁক দেখে সেখান দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে ছুটে চলে ভিন্ন ভিন্ন পথে; তারপর দ্রুততম পথ ধরে গন্তব্যে পৌঁছে সবগুলি খণ্ড আবার জোড়া লেগে যায় যথানিয়মে। এমনি ছোট ছোট খণ্ড হবার ফলে অতি সামান্য সময়ের ফাঁক পেলেই খণ্ডগুলি দূরের পথ পেরিয়ে যেতে পারে অতি তীব্র বেগে।

ইন্টারনেট আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা দুনিয়া জুড়ে এক আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের প্রতীক। দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়ে উঠেছে সহজ, তাৎক্ষণিক, সরাসরি। এক দেশ থেকে আরেক দেশে চিঠি পাঠালে তা অনেক সময় হারিয়ে যেতে পারে; যদি-বা পৌঁছয় তাহলেও সময় লাগতে পারে বেশ কয়েক দিন। ডাক বিভাগে সেন্সরশিপের সমস্যা তো আছেই। তেমনি এক ধরনের অলিখিত সেন্সরশিপ আছে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রেও— সেটা হয় তাদের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নীতি অনুযায়ী। টেলিফোন বা ফ্যাক্স-এর চেয়ে অনেক সস্তায় চলে যায় ই-মেইল। মাঝে কোন বাধা নেই, সেন্সরশিপ নেই, ভাবের আদান-প্রদান ঘটে সরাসরি। এতে স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের জন্য হয়ে উঠেছে বেশ বিপদ, তাদের পক্ষে আজ সাধারণ মানুষের ওপর কোন রকম দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা দুনিয়ার মানুষের কাছে গোপন রাখা হয়ে উঠছে শক্ত। আর ভাবের আদান-প্রদানের এই স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য হয়েছে অনুকূল।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর আগে যখন ছাপাখানার উদ্ভব ঘটেছিল তখন সেটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ, গণতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য বিরাট সহায়তা দিয়েছিল। আজ অনেকে বলছেন, কম্পিউটারভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ গণতন্ত্রের জন্য তার চেয়েও বড় শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার আর কেউ কেউ বলছেন, বইয়ের আবেদন ছিল মূলত মানুষের বুদ্ধির কাছে; কিন্তু সি-ডি রম ও মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক যে তথ্যপ্রযুক্তি আজ ব্যবসায়ীরা চালু করার চেষ্টা করছে তার আবেদন হবে মূলত মানুষের আবেগের কাছে, আর তার বেশির ভাগই হতে পারে অতি সস্তা আবেগ, সস্তা পণ্যস্তাবকতা। এতে গণতন্ত্রের বিস্তার যতটা না হোক এক ধরনের ব্যবসায়ীদের বিপুল মুনাফার সুযোগ যে ঘটবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা

তথ্যের মহাসরণির যে সুবিধে তা উন্নত দেশগুলির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দারুণ সুবিধে এনে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কোন পণ্য বাজারে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এই মহাসরণির কল্যাণে তার খবর দুনিয়া জুড়ে লক্ষ লক্ষ বাড়িতে পৌঁছে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য আজ আর কোন দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে না। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের খবর এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এমন কি সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছনোও হয়ে উঠেছে সহজ। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির

জন্যও কি তা একই রকম সুবিধে সৃষ্টি করবে? —এ প্রশ্নের জবাব আজ ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

উন্নত দেশগুলিতে মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, ভোগ্যসামগ্রীর উৎপাদনও বেড়েছে। তাই তাদের বাজার বাড়াবার জন্য তথ্যের মহাসরণি আজ অতি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সব দেশে কম্পিউটারের ব্যবহার এর মধ্যে ব্যাপক হয়ে উঠেছে। মার্কিন মুলুকে সব অফিসে তো বটেই, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ বাড়িতে আজ ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে; পুবের বাঘ সিঙ্গাপুরেও অবস্থা এরকমই দাঁড়িয়েছে। এদিক থেকে বাংলাদেশ আজও অনেক পিছিয়ে। এদেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বয়স্ক মানুষ আজও নিরক্ষর, প্রধান শহর অঞ্চলগুলির বাইরে টেলিফোনের ব্যবহারই তেমন ব্যাপক হয়ে ওঠে নি ; এখনও প্রতি হাজার পরিবারে একটি পরিবারও কম্পিউটার ব্যবহার করে না। এ অবস্থায় দুনিয়া জোড়া তথ্য মহাসরণির সুযোগ বাংলাদেশ কতখানি নিতে পারবে?

এই সমস্যার আরো একটা দিকও আছে। তথ্যের মহাসরণির মধ্যে পড়ছে পৃথিবীর ওপর মহাকাশে ঘুরপাক খাওয়া অসংখ্য কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ, আন্তর্জাতিক টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, অন্যান্য সংবাদ ও বিনোদন মাধ্যম। এগুলো আজ স্বভাবতই উন্নত দেশগুলির সরকার ও বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে। আমাদের কাছে আজ ইন্টারনেট নয়, নতুন তথ্যপ্রযুক্তির প্রধান প্রতীক হয়ে উঠেছে সি.এন.এন., জী-টিভি আর ভি.সি.আর.। এসব যেমন আমাদের কাছে বাইরের বিশ্বের তাৎক্ষণিক এবং অনেক ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ খবর পৌঁছে দিচ্ছে, তেমনি আবার এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না এমন অনেক অনুষ্ঠান দেখিয়ে এক ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনেরও ভিত তৈরি করছে। নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ওপর শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির কর্তৃত্ব স্বভাবতই বিশ্বের সংবাদ প্রবাহের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আরো নতুন ধরনের সুযোগ এনে দিচ্ছে।

কোন কোন দেশ (যেমন ইরান, উত্তর কোরিয়া, সিঙ্গাপুর) এধরনের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে ডিশ অ্যান্টেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে হয়তো সাময়িকভাবে সমস্যা কিছুটা এড়ানো যাবে, কিন্তু তাতে সমস্যার সত্যিকার সমাধান ঘটবে বলে মনে হয় না। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সারা পৃথিবীতে ক্রমেই এমন ব্যাপক হয়ে উঠছে যে, কোন দেশের পক্ষেই আজ এর ব্যবহার বাদ দিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগোনো সম্ভব নয়। বরং এরকম উটপাখির নীতি অবলম্বন করলে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উন্নত দেশগুলির তুলনায় আরো পিছিয়ে পড়তে হবে। সিঙ্গাপুর ডিশ অ্যান্টেনার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেও অর্থনৈতিক কারণে কম্পিউটার ব্যবহার ও ইন্টারনেট সংযোগ বাড়াবার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। এই দেশটির আয়তন মোটামুটি বৃহত্তর ঢাকা শহরের মতো আর লোকসংখ্যা ঢাকা শহরের অর্ধেকেরও কম; অথচ সে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চ শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ রয়েছে বিশ হাজারের ওপরে; বাংলাদেশে এরকম বিশেষজ্ঞের সংখ্যা এক হাজারও হবে কি না সন্দেহ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বরং সুবিবেচনার কাজ হবে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ওপর দ্রুত অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া। এর জন্য প্রয়োজন হবে একযোগে অনেকগুলি ক্ষেত্রে সমন্বিত আয়োজনের। সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, নতুন তথ্যপ্রযুক্তির অনুকূল শিল্প ও বাণিজ্য নীতি গ্রহণ— এধরনের নানা ক্ষেত্রে একযোগে এগোতে হবে। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এক্ষেত্রে যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করা হলে বাংলাদেশের কুশলীরা রপ্তানিমুখি ডাটা এন্ট্রি ও সফ্‌টওয়্যার শিল্প থেকে দেশের জন্য অদূর ভবিষ্যতে যে পরিমাণ অর্থ অর্জন করতে পারেন তাতে এদেশের অর্থনৈতিক চেহারা একেবারে পালটে যেতে পারে। কিন্তু এর সুযোগ গ্রহণের জন্য এখনই কাজে নামতে হবে ; দেরি হলে এসব কাজ অন্য দেশের কাছে চলে যাবে। আর তাছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনাতে দক্ষতা আনবার জন্যও নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ আজ আশু প্রয়োজন।

উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলিকে আজকের পরিস্থিতিতে আরো একটি দায়িত্ব পালন করতে হবে। সে হল তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাতে এসব দেশের স্বার্থ রক্ষিত হয় তার জন্য নানা আন্তর্জাতিক ফোরামে চাপ সৃষ্টি করা। পৃথিবীতে আজ উন্নয়নশীল দেশগুলির সংখ্যাই বেশি; উন্নয়নশীল দুনিয়ার লোকসংখ্যা আজ সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রায় আশি শতাংশ। মানব সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে তাই এই তথ্যপ্রযুক্তির মহাসরণিকে কিছুতেই উন্নত দেশগুলির হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হতে দেওয়া যায় না। উন্নয়নশীল দেশগুলি যদি আজ তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একজোট হয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যথাযথ চাপ সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই শুধু এই নতুন প্রযুক্তিকে উন্নত দেশগুলির কুক্ষিগত হয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

আগামী শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

মানুষ যে মানুষ তার একটা বিশেষ কারণ হল তার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, অপরিমেয় উদ্যোগ আর বিপুল প্রত্যাশা। এ মানুষের এক অন্তর্গত চরিত্র। এই আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশার যেখানে সমাপ্তি, সেখানে মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্বেরও বিলুপ্তি; কেননা নিছক জীবন ধারণের তাড়নায় আক্রান্ত হলে অন্য জীবের সঙ্গে তার আর পার্থক্য করা যায় না। বিপুল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে নিরন্তর সাধনার, সংগ্রামের, নানা বিপদ আর বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়; তাকে শ্রমে, ত্যাগে, প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে। তার সভ্যতাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তা বলে মানুষের আকাঙ্ক্ষায়, প্রত্যাশায় সীমাবদ্ধতা নেই তা নয়। তাতে সময়, সুযোগ, সম্ভাবনার প্রশ্ন যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে যোগ্যতা আর যুক্তিযুক্ততার প্রশ্নও। বামনের চাঁদে হাত দেবার স্বপ্ন তাই কখনো বিসদৃশ মনে হতে পারে। অথচ আবার অসাধ্য সাধন করার এমনি স্বপ্ন মানুষের মনে নিরন্তর দেখা দেয় বলেই মানুষ ক্রমাগত তার অর্জনের দিগন্তকে প্রসারিত করে চলে। — অতীতের কৃতি, বর্তমানের সম্ভাবনা আর ভবিষ্যতের প্রত্যাশার মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব সেটা আজ এই শতাব্দীর ক্রান্তিকালে বাংলাদেশের বেলায় যেমন করে প্রকট এমন আর খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

দরিদ্র দেশের প্রত্যাশা

সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশগুলোর দলে পড়ে। একটি দেশের দারিদ্র আজ আর শুধু সে দেশের মাথাপিছু আয়ের মাপকাঠিতে বিচার করা হয় না। ১৯৯০ সাল থেকে জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রত্যাশিত আয়ু, বয়স্ক সাক্ষরতার হার প্রভৃতি মাপকাঠির ভিত্তিতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মানব-উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করছে। প্রথম বছর এই সূচকে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৩০টি দেশের মধ্যে ১০৮; ১৯৯৫ সালের তালিকায় দাঁড়ায় ১৭৪টি দেশের মধ্যে ১৪৬। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানব-উন্নয়ন সূচককে একক ধরে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের সূচক ছিল ০.৩৬৪। অথচ একই বছরে উচ্চ প্রত্যাশিত আয়ু (৭১.৯ বছর, বাংলাদেশে ৫৫.৬ বছর) এবং বয়স্ক সাক্ষরতার হারের (৮৯.৩%, বাংলাদেশে ৩৬.৪%) কারণে এই অঞ্চলের আরেকটি দেশ শ্রীলঙ্কার অবস্থানের ক্রম ছিল ৯৭ আর মানব-উন্নয়ন সূচক ০.৭০৪

—ফিলিপাইন এবং চীনেরও ওপরে। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, চীন ও বাংলাদেশের গড়পড়তা মাথাপিছু জাতীয় আয় যথাক্রমে ৭৭০, ৫৪০, ৪৭০ ও ২২০ ডলার।

বাংলাদেশের মতো এমন জনঘনত্ব পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই (দু'একটি নগর-রাষ্ট্র ছাড়া)। দেশের অর্ধেকের বেশি লোক চরম দারিদ্রসীমার নিচে; গত দু'দশকে কৃষি বা শিল্পক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মজুরি মোটেই বাড়ে নি, বরং সাধারণ মানুষের গড় পুষ্টিমান ক্রমাগত কমছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর মাত্র গোটা দু'তিন বিরল দেশের একটি যেখানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের গড় আয়ু কম, যে দেশে গত পঞ্চাশ বছরে মানুষের গড় উচ্চতা বা ওজন বাড়ে নি বরং কমেছে।

এই গভীর দারিদ্র আর চরম পশ্চাদপদতার পরিবেশে আমাদের পরম প্রত্যাশা আধুনিক যুগের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যদি পারে তার আশ্চর্য জাদুকরী সোনার কাঠির স্পর্শে এদেশকে বাঁচিয়ে তুলতে। এই প্রত্যাশা আজ আরো বেশি তীক্ষ্ণ এ কারণে যে, বিগত একটি শতাব্দীতে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানব প্রগতির সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসেবে; তাছাড়া বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র দূরীকরণের বা সমাজ উন্নয়নের আর তেমন কোন সম্ভাবনাময় হাতিয়ার দিগন্তে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

জনবিস্ফোরণে আক্রান্ত, দুর্যোগতাড়িত এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মানুষ যে আজও টিকে আছে তাও বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আশ্চর্য বিকাশেরই ফলে। গত শতাব্দীতে এদেশের জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় ছ'গুণ হয়েছে, কিন্তু আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তির কল্যাণে সেই সঙ্গে প্রায় সমান তালে বেড়েছে খাদ্য উৎপাদন। এমন গভীর দারিদ্র সত্ত্বেও মানুষের গড়পড়তা আয়ু দ্বিগুণ হয়ে ৫৬ বছরে দাঁড়িয়েছে— সাধারণ স্বাস্থ্য জ্ঞান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে। এদেশের সব বয়সের মানুষের গড় সাক্ষরতার হার শতাব্দীর শুরুতে ছিল মাত্র ছ'শতাংশের মতো, সেখানে আজ তা ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। সড়ক যোগাযোগের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, বেড়েছে মানুষের গতি; বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রামে গ্রামে যেতে আরম্ভ করেছে; ইঞ্জিনচালিত নৌকা, খাবার স্যালাইন প্রভৃতি কিছু ছোটখাট প্রযুক্তির বিস্তার মানুষের জীবনে ব্যাপক রূপান্তর এনেছে; আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সারা বিশ্বের সংবাদ ও বিনোদন ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের সংযোগ বেড়েছে।

কিন্তু এই বিকাশ আর বিস্তারের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হল এসব ঘটেছে একটি স্বাধীন, আত্মনির্ভর অর্থনীতির অংশ হিসেবে নয়, বরং মূলত একটি পরনির্ভর দেশের অপরিকল্পিত, কাকতালীয় অগ্রগতির মধ্য দিয়ে। এই শতাব্দীর শুরুতে এদেশের কিছু সংস্কৃতি-নায়ক দেশের সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশের জন্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চার অপরিহার্যতার কথা খুবই জোর দিয়ে বলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এঁদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান গবেষণার বিকাশের জন্যও প্রাণপাত শ্রম করে গিয়েছেন। তার ফলে এদেশে

নানা ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিজ্ঞান গবেষণাগার গড়ে উঠেছে, স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো গৌণ আকারে হলেও একটি স্থান করে নিয়েছে।

কিন্তু আজকের পৃথিবীর মাপকাঠিতে এ অগ্রগতি সামান্য, এদেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চার কেবল একটি ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে বলা যেতে পারে। আমাদের কাছাকাছি কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করে অর্ধেক বা তার বেশি; আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই হার বড়জোর এক-চতুর্থাংশ, ডিগ্রি কলেজে মাত্র পাঁচ শতাংশের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান দায়িত্ব হল নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন; অথচ আমাদের দেশে সেখানে গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ মোট বরাদ্দের হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। মাধ্যমিক স্তরের শেষের পরীক্ষায় আজ মাত্র এক-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। এ পরিস্থিতি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ বা আর্থসামাজিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল নয় তা সহজেই বোঝা যায়।

এদেশের অগ্রগতির পথে আজ বাধার অন্ত নেই। দেশব্যাপী অশিক্ষা, মৌলবাদ ও কুসংস্কারের আধিপত্য, গণতন্ত্রচর্চার অভাব, সন্ত্রাস ও পেশিশক্তির প্রাবল্য, স্বনির্ভর অর্থনীতির দিকে এগোবার ক্ষেত্রে দেশের নীতিনির্ধারকদের ব্যর্থতা— এ সবই এদেশের মানুষের সৃজনশীল বিকাশের পথে বাধার পাহাড় তৈরি করে রেখেছে। তবু এর মধ্যেও আমরা আশায় বুক বেঁধে সামনের দিকে তাকাই— এদেশের সাহসী জনগণ সকল বাধার বেড়ি ভেঙে স্বাধীন বিকাশের পথে এগিয়ে যাবে, এ ভরসা রাখি।

শিক্ষার ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ

আগামী শতাব্দীতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই আসে শিক্ষা বিস্তারের কথা। সমগ্র জনগণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার না ঘটলে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিস্তার ঘটা সম্ভব নয়। গত এক শতাব্দীর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এটাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। জাপান, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন— যেসব দেশে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, সব দেশেই সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে আগে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাল রাখার তাগিদে আমাদের দেশেও 'সবার জন্য শিক্ষা'র কথা আজকাল হরহামেশা শোনা যাচ্ছে। যতটা সদিচ্ছা ব্যক্ত হচ্ছে তা যদি শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয় তাহলে আগামী দু'দশকের মধ্যে আট বছর মেয়াদি বুনিয়াদি শিক্ষা দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে।

আট বছর মেয়াদি বুনিয়াদি শিক্ষা দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছলে এদেশের জনসম্পদের একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটবে। এই বুনিয়াদি শিক্ষা অবশ্যই শুধু সাক্ষরতা হবে না— তাতে থাকবে ভাষা, গণিত, প্রকৃতিপাঠ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয়, ইতিহাস-সমাজ-গণতন্ত্রের পাঠ, হবে চিন্তাশীল, সৃজনশীল, উৎপাদনশীল মানুষ তৈরির শিক্ষা; মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সবাই নেবে বিজ্ঞানের পাঠ। আর সে সব

মানুষের মধ্যে যারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ মেধাসম্পন্ন তাদের জন্য থাকবে উচ্চতর শিক্ষার, গবেষণায় আত্মনিয়োগের আর সে গবেষণার ফলাফলকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ব্যাপক সুযোগ। তাহলেই এদেশের মেধা নিয়োজিত হবে এদেশের মানুষের দারিদ্র নিরসনে, জীবনের বহুমুখী নানা সমস্যার সমাধানের কাজে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক নানা পেশাজীবী দক্ষ মানুষ তৈরি হবে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে— প্রকৌশলী, চিকিৎসাবিদ, কৃষিবিদ, যন্ত্রকুশলী, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবেশবিদ। তারা তাদের উন্নত মেধা আর অর্জিত দক্ষতা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদেশে পাড়ি দেবার কথা ভাববে না, বরং উন্নত বিশ্বের সর্বাধুনিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করবে এদেশের জনগণের কল্যাণে।

শুধু গুটিকতক বিশেষজ্ঞ বা পেশাজীবী একটি দেশের ভাগ্য ফেরাতে পারে না; ভাগ্য ফেরাতে পারে সমগ্র দেশের সকল মানুষের সমবেত উদ্যোগ। আগামী শতকে শিক্ষার আলোক আর জীবনের সকল স্তরে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা ক্রমে ক্রমে বদলে দেবে এদেশের সমগ্র জনসমাজের চরিত্র। শুধু প্রাণ ধারণের প্রাণান্ত চেষ্টা থেকে মুক্তিলাভ করে তারা অবগাহন করতে শুরু করবে বিশ্বের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারে। ইতোমধ্যে সারা পৃথিবী এগিয়ে যেতে থাকবে প্রচণ্ড বেগে; তার ফলে এদেশের মানুষের কাছে অবারিত হবে সারা বিশ্বের বিশাল জ্ঞানের জগৎ। তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশের কল্যাণে ইন্টারনেট সংযোগ হয়ে উঠবে রেডিও-টেলিফোনের মতোই সবার কাছে সহজলভ্য একটি উপকরণ। তার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডার আর শুধু গুটিকতক পণ্ডিতজনের আওতায় থাকবে না, হয়ে উঠবে গণমানুষের আয়ত্ত। সেই উজ্জ্বল আলোকিত জ্ঞানের ভুবনে প্রবেশ করে এদেশের মানুষের মানসজগৎ দ্রুত বিকাশের পথে এগোবে।

নতুন শতাব্দীতে উত্তরণ বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে খুব সহজ হবে তা বলা যায় না। জন্মশাসনের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও খুব সম্ভব আগামী শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশের জনসংখ্যা বেড়েই চলবে; মধ্যশতাব্দীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পঁচিশ কোটির কাছাকাছি পৌঁছবে— বিশেষভাবে সতর্ক না হলে এই অঙ্ক ছাড়িয়েও যেতে পারে। দেশের গড় জনঘনত্ব এখনকার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে আটশ' থেকে দু'হাজারের কাছাকাছি পৌঁছবে; তার ফলে বাসস্থান, কৃষি উৎপাদন, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেবে তার সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে এখন থেকে। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাবও আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি স্পষ্ট হয়ে উঠবে; তাতে তলিয়ে যাবে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের বিশাল এলাকা; নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় জলাবদ্ধতা দেখা দেবে অনেক জায়গায়। সে সবের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে এখন থেকেই। দেশের উপকূল অঞ্চল নিয়ে, জলবায়ু নিয়ে, গাছপালা পশুপাখি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা দরকার এখনই।



হাতের কব্জির সঙ্গে লাগানো যুগল ঘড়ি ও টেলিফোন— শিগগিরই বাজারে আসতে পারে।

পৃথিবী এগিয়ে যেতে থাকবে

আগামী শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আমাদের আশার কথা শোনাচ্ছেন অনেক। পৃথিবীর গড়পড়তা মানুষ আজকের চেয়ে অনেক ভাল খাবে-পরবে, ভাল বাড়িতে থাকবে, বেশি দিন বাঁচবে, কাজের ঘন্টা কমবে, অনেক বেশি সময় মানুষ ঘরে পরিবারের সঙ্গে কাটাবে, বিনোদনের সুযোগ বাড়বে। প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষকে একঘেয়ে কাজের হাত থেকে মুক্তি দেবে। শ্রমের কাজ করবে যন্ত্রপাতি, মানুষ শুধু করবে বুদ্ধির কাজ; অবশ্য যে সব বুদ্ধির কাজ শ্রমসাধ্য বা একঘেয়ে তাও করে দেবে কম্পিউটার— সে সব কম্পিউটারকে বুদ্ধি দেবে মানুষ। নিতান্ত জীবনধারণের কাজে সময় কম দিতে হওয়ায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক বাড়বে।

এমনি সব আশার কথা আমরা আজই যে প্রথম শুনছি তা নয়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে শোনা গিয়েছিল পরমাণু-শক্তি মানুষের জন্য নিয়ে আসছে প্রাচুর্যময় এক নতুন পৃথিবী। খনিজ তেল আর গ্যাস যেখানে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবার পথে সেখানে পরমাণু-শক্তি আজ অনেক দেশে অর্ধেকের বেশি বিদ্যুৎশক্তি যোগাচ্ছে; চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়ার প্রয়োগ বিপুল কল্যাণ বয়ে এনেছে। তবু উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য পরমাণু-শক্তির অবদান তেমন কিছু নাটকীয় হয় নি। সেই সঙ্গে হিরোশিমা-নাগাসাকি আর চরনোবিলের বিস্ফোরণের বিভীষিকা মানুষের মনে বিপুল শঙ্কারও জন্ম দিয়েছে।

আবার আর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী শোনা গিয়েছিল যেগুলো প্রথমটায় শুনতে ভাল কিন্তু শেষতক তা মানুষের তেমন পছন্দ হয় নি। যেমন শোনা গিয়েছিল আগামী দিনে আর রোজ রোজ কষ্ট করে খাবার দাবার খেতে হবে না; শুধু একটি ঘনীভূত পুষ্টিবড়ি খেলেই চলবে, তাতেই কাটানো যাবে দিনের পর দিন। কিন্তু এমন পুষ্টিবড়ি যদি তৈরি করা সম্ভব হয়ও তাহলেও সেই বড়ি খেয়ে খিদে মেটালে খাওয়ার আনন্দ একেবারে মাটি হবে; মানুষ কি তা মেনে নিতে চাইবে? তেমনি শোনা যাচ্ছে ভবিষ্যতে পরখনলে শুধু নতুন জাতের গাছপালা পশুপাখি নয়, ইচ্ছেমতো গুণাগুণসম্পন্ন মানুষও জন্মানো যাবে। কারিগরি দিক থেকে তা যদি কোনদিন সম্ভব হয়ও তাহলেও নৈতিক দিক থেকে এধরনের অগ্রগতি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য

হবার সম্ভাবনা খুব কম।

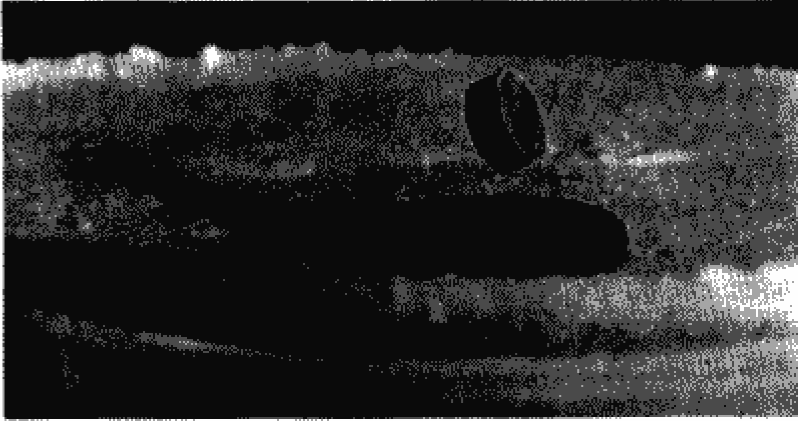
তবু মানুষের পছন্দসই পরিবর্তনও কিছু কম ঘটছে না। ঘরে ঘরে (অন্তত যাদের সাধ্য আছে তাদের) টিভি, ভিসিআর, কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি), কম্পিউটার, মোবাইল ফোন এসব আজ চমক সৃষ্টি করছে। কিন্তু এগুলোই তো শেষ নয়। দু'হাজার সাল আসতে আসতে আসছে এমনি আরো অনেক নতুন চমক। টেলিভিশন আপনাকে জানিয়ে দেবে শত শত চ্যানেলের মধ্যে কখন কোন্ কোন্ চ্যানেলের অনুষ্ঠান হবে আপনার রুচিমাফিক; তার মধ্য থেকে আপনি আপনার পছন্দমতো অনুষ্ঠান বেছে নিতে পারবেন। টেলিভিশন এমন ছোট হবে যা আপনার হাতের তালুতে ধরা যায়; আবার এমন বড় হবে যে সারা দেয়াল জুড়ে দেখা যাবে ছবি। যোগাযোগব্যবস্থা তামার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎনির্ভর হবে না, হবে কাচতন্তুর মধ্য দিয়ে আলোকনির্ভর। তাতে যোগাযোগের দক্ষতা বহুগুণে বাড়বে ।

আগামী দিনে বাড়ি হবে এমন যেখানে সবকিছু আপনার চাহিদামাফিক ঘটতে থাকবে আপনাআপনি। এর মধ্যেই কম্পিউটার জগতের সম্রাট বিল গেট্স্ তৈরি করেছেন নিজের জন্য এমনি বাড়ি। সেখানে ঘরে ঘরে টেলিফোন থাকলেও গেট্সের জন্য টেলিফোন এলে তাঁর সবচেয়ে কাছাকাছি যে টেলিফোনটি শুধু সেটিই বেজে ওঠে, অন্যগুলো নয়। অর্থাৎ টেলিফোনও আপনাআপনি টের পেয়ে যায় তার মনিব কখন কোথায় আছেন। আগামী দিনে কম্পিউটার চালানো হবে আজকের চেয়ে অনেক সহজ; চালাতে কোন কারিগরি বা জটিল সঙ্কেতমালা দরকার হবে না, কোন রকম চাবিও টিপতে হবে না, শুধু মুখের নির্দেশেই তা নানা রকম কাজ করে দেবে।

একুশ শতকে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আসবে আরো বিরাট রকম পরিবর্তন। আজই আমাদের শরীরের নানা রকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, হাড়, চামড়া, কান-নাক, হাত-পা, কিডনি বা বৃক্ক বদলে ফেলা যাচ্ছে; ভবিষ্যতে আরো বেশি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদলানো যাবে। আজকে যে সব রোগ চিকিৎসার অতীত বা দুরারোগ্য বলে গণ্য সে সবকে কাবু করার কায়দা মানুষ জেনে ফেলবে। ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, স্কেরোসিস, ক্যানসার এসব রোগ প্রতিরোধের কৌশল মানুষের আয়ত্ত হবে। জিন-প্রযুক্তি অসংখ্য রকম বংশগত রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে।

একুশ শতকে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারবে এমন ভরসা নেই, কিন্তু জরাগ্রস্ততা আজকের তুলনায় অনেকখানি কমানো যাবে। একুশ শতকের মাঝামাঝি ৬৫ বছরের মানুষকে মনে হবে আজকের ৪৫ বছরের মানুষের মতো। দু'হাজার বছর আগে গ্রিক আর রোমানদের সময়ে মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল মাত্র বিশ বছর, আজ দাঁড়িয়েছে ৭০-এর কাছাকাছি; ২০৩০ সালে গড় আয়ু দাঁড়াতে পারে ৮৫ বছর, আর ২০৫০ সাল নাগাদ ১০০ বছর হওয়াও বিচিত্র নয়।

তেমনি পরিবর্তন আসবে খাবার দাবার আর রান্নাঘরের ব্যবস্থায়। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ ধরনের মিষ্টি খাবার তো আগেই তৈরি হয়েছে। এমনি আরো নানা রকম মজাদার খাবার আসছে আগামী দিনে। এমন চাল তৈরি হবে যাতে প্রোটিন থাকবে আজকের গমের চেয়ে বেশি, এমন মাংস তৈরি হবে যাতে চর্বি



উচ্চ তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী বস্তু যে প্রচণ্ড চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে তাতে ধাতব খণ্ড শূন্যে ভাসছে।

থাকবে খুব কম, এমন গাজর তৈরি হবে যাতে ভিটামিন এ থাকবে আজকের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। শুধু নানা রকম খাবারের উপকরণ নয়, সে সব খাবারের তৈরির পদ্ধতিতেও রূপান্তর ঘটবে। ফরাসি দেশের রন্ধনশৈলীর সুনাম দুনিয়াজোড়া; তার খেসারত দিতে হত অবশ্য ফরাসি রমণীদের। এককালে তাঁদের রান্নাঘরে কাটাতে হত দিনে গড়পড়তা পাঁচ ঘণ্টা, আজ সে সময় চল্লিশ মিনিটে দাঁড়িয়েছে; ভবিষ্যতে আরো কমবে।

অবশ্য এসব অগ্রগতির উল্টোপিঠেই ওত পেতে আছে নানা জটিল সমস্যা। যন্ত্রচালিত যান মানুষকে যেমন দিয়েছে বেগ, তেমনি পরিবেশের মারাত্মক দূষণ ঘটিয়ে বিপদও কম সৃষ্টি করে নি। যন্ত্রপাতি যেমন সৃষ্টি করছে আরাম-আয়েশ তেমনি নিয়ে আসছে বেকারত্বের অভিশাপ। মানুষ যত দীর্ঘজীবী হচ্ছে তেমনি বড় হয়ে উঠছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রবীণদের যত্ন নেবার সমস্যা। আর রোগ-ব্যাধিকে জয় করার ফলে অতিবৃদ্ধ অথর্ব মানুষদের পৃথিবী থেকে চিরতরে নিষ্ক্রান্ত হবার পথ কি ক্রমেই রুদ্ধ হবার উপক্রম করবে না?

মহাকাশের পথে

পৃথিবীর বাইরে ফুটবল মাঠের মতো বিশাল আকারের মহাকাশ-স্টেশন তৈরির কাজ এর মধ্যে শুরু হয়েছে। নতুন নতুন হালকা কৃত্রিম বস্তু উদ্ভাবনের ফলে মহাকাশ-স্টেশন তৈরির ব্যয় কমে আসছে। এসব স্টেশন থেকে আগামী শতকে সৌরজগতের দিকে দিকে মানুষের অভিযাত্রা শুরু হবে। একুশ শতকের গোড়ার দিকে আরম্ভ হবে পৃথিবী থেকে চাঁদে যাতায়াত; শতাব্দীর মাঝামাঝি মানুষ মঙ্গলগ্রহে আস্তানা গাড়ার সামর্থ্য অর্জন করবে। পৃথিবী থেকে চাঁদে যেতে লাগবে মাত্র

চারদিন, অথচ মঙ্গলে যেতে লাগবে সাত মাস (কলম্বাসের ইউরোপ থেকে আমেরিকায় যেতে লেগেছিল দু'মাস)। এভাবে মহাকাশ-স্টেশন স্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমে ক্রমে সৌরজগতের ওপর তার আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আরম্ভ করবে।

মানুষ এর মধ্যেই মহাকাশে সৌরজগতের বাইরে আরো নক্ষত্রের আশেপাশে গ্রহজগতের হদিস পেয়েছে; সে সব গ্রহজগতে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কি না তার সন্ধানও জোরেশোরে চলছে। হয়তো আগামী শতকে এমনি কোন বুদ্ধিমান জীবের হদিস মানুষ পেয়ে যাবে। তখন মহাকাশে ভিন্ন কোন নক্ষত্রলোক বা গ্রহলোকের প্রাণীদের সঙ্গে গড়ে উঠবে মানুষের মিতালি। সেদিন ঘটবে মানুষের সভ্যতার এক নতুন উত্তরণ; মানুষ জানবে সে এই মহাবিশ্বে নিতান্ত নিঃসঙ্গ নয়। ভিন্ন গ্রহলোকের সভ্যতার সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সেদিন হয়তো মানুষের সভ্যতার বিকাশের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

একুশ শতকে উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে সারা পৃথিবী আরো কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে; তথ্যপ্রযুক্তি, জিনপ্রযুক্তি, নতুন গুণাগুণের বস্তু উদ্ভাবন, নতুন নতুন শক্তির উৎস সন্ধানে মানুষের সাফল্য, অতিদ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও বিনোদনের নানা আশ্চর্য উপকরণ মানুষের জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করবে। সারা পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণে বাড়বে; অবশ্য তাতে মানুষের জীবনের জটিলতা আজকের চেয়ে কিছুটা কমবে কিনা তা বলা শক্ত।

দুনিয়া জুড়ে রূপান্তরের এই বিপুল বেগবান ধারায় আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় জীবনমানের কাছাকাছি কি বাংলাদেশের মানুষ পৌঁছতে পারবে?

আজ এবং আগামীকাল এদেশের আর্থসামাজিক বিকাশের জন্য আমরা কোন্ পথ বেছে নিই তার ওপরই নির্ভর করবে এ প্রশ্নের জবাব।

স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

সারা পৃথিবী আজ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিপুল বেগে এগিয়ে চলেছে; শুধু যেন এগোতে পারছি না আমরা এই বাংলাদেশের মানুষেরা। এদেশে গত পঁচিশ বছরের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির খতিয়ান নিতে গেলে একাত্তরের স্বাধীনতা আমাদের মনে যে বিপুল প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল তাকে স্তব্ধ করে দিয়ে আমাদের সীমাহীন ব্যর্থতাই যেন বেশি করে চোখে পড়ে।

এই বিশ শতকে পৃথিবীর জনসংখ্যা দেখতে দেখতে তিন গুণের ওপর বেড়েছে; মোটামুটি গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ নাগরিক জীবনের সুযোগ লাভ করেছে; কৃষি-উৎপাদন শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলায় নি, সারা পৃথিবীর সব অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্যও পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের প্রযুক্তি আজ মানুষের আয়ত্ত; উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এক শতাব্দীর মধ্যে মানুষের গড় আয়ু প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছে; নানা ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনে, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য নানা শক্তির ব্যবহারে, পরিবহন, যোগাযোগ আর বিনোদনের পদ্ধতিতে যে বিপ্লব ঘটেছে তা আজ অতি স্পষ্ট। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে এমন বিরাট পরিবর্তন ইতিহাসে আর কখনো দেখা দেয় নি। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগা মানুষ আমরা যে তিমিরে ছিলাম যেন সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছি।

পাশ্চাত্যের 'উন্নত' দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে চিরকাল এমন দুর্গত ছিল তা নয়। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ইউরোপ ও ভারত উপমহাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানে তেমন গুরুতর ফারাক ছিল না। বরং ইতিহাসের নানা পর্যায়ে এদেশে গণিত, রসায়ন, ভেষজ, কারুশিল্প এসবের চর্চায় উঁচুমানের কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর্যটক আর ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, সেকালে এদেশে উন্নত ধরনের বস্ত্র, রেশম, শর্করা, লবণ ও নৌযান শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। তবে অষ্টাদশ শতক থেকে দীর্ঘকাল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের দমনমূলক নীতি এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করে।

বিশ শতকের শুরুতেও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে মানুষের গড় জীবনমানের সূচক এদেশের চেয়ে দশ গুণের বেশি ছিল না; অথচ আজ এই পার্থক্য বাড়তে বাড়তে প্রায় একশ' গুণে পৌছেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের একটা প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অবদানকে কাজে লাগিয়ে এদেশের মানুষকে দুঃসহ দারিদ্র থেকে মুক্তি দেয়া এবং পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে আমাদের গড়

জীবনমানের পার্থক্য ক্রমে ক্রমে কমিয়ে আনা। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনে আমরা মোটেই সফল হতে পারি নি ; বরং দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের হার ক্রমেই বাড়ছে আর পশ্চিমী দেশের সঙ্গে এদেশের মানুষের জীবনমানের পার্থক্য ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে।

গবেষণার অবকাঠামো

নানা ব্যর্থতার মধ্যেও গত দু'যুগে বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণার একটা মোটামুটি অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। সত্তরের দশকের শুরুতে স্বাধীনতা লাভের সময়ে বাংলাদেশে অল্প গুটিকয়েক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর মাত্র কয়েকশ' গবেষক বিজ্ঞানী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল মূলত পাকিস্তানের অন্য অংশের কোন মূল গবেষণাগারের আঞ্চলিক শাখা। এগুলো ছড়ানো ছিল সরকারের নানা মন্ত্রণালয় আর বিভাগের অধীনে। এসব প্রতিষ্ঠানকে সুসংবদ্ধ করে জাতীয় গবেষণা কর্মসূচির অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সরকারের একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর গত দু'যুগে দেশে ডজনখানেক বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাঁচ ডজনের বেশি জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা গড়ে উঠেছে। এসব গবেষণা সংস্থায় আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে গবেষণা চলছে। দেশে গবেষক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের মোট সংখ্যা স্বাধীনতার পরপর ১৯৭৩ সালে হিসেব করা হয়েছিল ২৩,৫০০; তার মধ্যে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন ১,৬৪৯ জন। ১৯৯৫ সালে ব্যাঙ্গডক পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা যায়, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের মোট সংখ্যা বেড়ে হয়েছে এক লাখের কাছাকাছি। তার মধ্যে সরাসরি গবেষণা কাজে নিয়োজিত আছেন প্রায় সাড়ে সাত হাজার।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত তিনটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা পরিষদ ও ন'টি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই তিনটি গবেষণা পরিষদ হল : ক. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, খ. বাংলাদেশ পরমাণু-শক্তি কমিশন ও গ. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ। এছাড়া বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ নামে আরো একটি পরিষদ আছে তবে তার সঙ্গে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান সরাসরি সংযুক্ত নয়। গবেষণা পরিষদগুলির মূল দায়িত্ব গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সমন্বয়; তবে প্রায়শ সরাসরি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সেবামূলক ব্যবস্থা পরিচালনাও থাকে এদের আওতায়। জাতীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারণ ও এদের কাজের সামগ্রিক সমন্বয় সাধনের দায়িত্বে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান কাজ যেখানে মৌলিক গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষা সেখানে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের গবেষণা সংস্থাগুলি স্বভাবতই দেশের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রয়োগমুখী গবেষণায় নিয়োজিত। যেমন কৃষিক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সমস্যা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাবার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার প্রয়োগ,

কীটনাশক, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। এতে সত্তরের দশকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত জয়দেবপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এখানকার বিজ্ঞানীরা প্রায় দু'ডজন উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন এবং এগুলো কৃষকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। এসব উন্নত জাতের ধানবীজ সারাদেশে ব্যবহৃত হবার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও ধানের ফলন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটে উদ্ভাবিত গমবীজ সাফল্যের সঙ্গে দেশের নানা অঞ্চলে চাষ করা হচ্ছে আর তার ফলে গত ক'বছরে এদেশে ধানের পাশাপাশি গম একটি প্রধান খাদ্যশস্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট নিয়েও উল্লেখযোগ্য গবেষণা হচ্ছে। পাট গবেষণা ইন্সটিটিউটে উদ্ভাবিত হয়েছে সাদা আঁশযুক্ত 'ধবধবে পাট', নানা ধরনের উচ্চ ফলনশীল দেশী ও তোষা পাট এবং পোকামাকড় দমনসহ পাট চাষের উন্নত পদ্ধতি। এছাড়া পাটের আঁশকে পশমের মতো গুণাগুণসম্পন্ন করে তা থেকে উন্নতমানের কার্পেট, পশমী পোশাক এসব তৈরি সম্ভব হয়েছে। কাঁচা পাটগাছ থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। এছাড়া ঈশ্বরদিতে আখ গবেষণা ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামে বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, শ্রীমঙ্গলে চা গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং মৎস্য-গবেষণা ইন্সটিটিউটেও নানা ধরনের প্রয়োগমুখী গবেষণা চলছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের প্রধান লক্ষ্য হল দেশীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে নানা পণ্যদ্রব্যের দিক থেকে যথাসম্ভব স্বনির্ভর করা। এখানে দেশজ নানা উপাদান ব্যবহার করে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী প্রায় তিনশ' প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে; তার মধ্যে অর্ধেক শিল্প উৎপাদনের জন্য লিজ দেয়া হয়েছে এবং অনেকগুলি উৎপাদনেও গিয়েছে। পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল পাট ও তুলা মিশিয়ে তৈরি 'জুটন' তন্তু। এছাড়া এখানকার বিজ্ঞানীরা উন্নত ধরনের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, সৌর চুল্লি, উন্নত চুলা, স্পিরুলিনা শেওলা থেকে আমিষ এসব নিয়ে যে গবেষণা করেছেন তা এদেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য বায়োগ্যাস, উন্নত চুলা, সৌর চুল্লি প্রভৃতি সারা দেশে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এধরনের আরেকটি বহুমুখী গবেষণা পরিষদ বাংলাদেশ পরমাণু-শক্তি কমিশন। গত দু'দশকে সাভারে এই কমিশনের তত্ত্বাবধানে একটি বড় আকারের পরমাণু-শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব ইন্সটিটিউটে স্বাস্থ্য, কৃষি, বিকিরণের সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণ ও শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা, যন্ত্রপাতি না ভেঙে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে খুঁত পরীক্ষা, জলবিজ্ঞান, খনিজ অনুসন্ধান, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি বিভিন্নমুখী গবেষণা চলছে। সেখানে একটি তিন মেগাওয়াট শক্তির গবেষণামূলক পারমাণবিক চুল্লিও স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে পারমাণবিক প্রযুক্তির সাহায্যে মস্তিষ্ক, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতির টিউমার ও অন্যান্য রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে পাবনা জেলার রূপপুরে

একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির কথা তিন দশক ধরেই শোনা যাচ্ছে ; কিন্তু উঁচু মহলের সিদ্ধান্তহীনতা ও যথাযথ উদ্যোগের অভাবে পদ্মার ধারে এই প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট ৩৩০ একর জায়গায় এখন গরু চরছে। এদিকে দেরির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

একটি অপেক্ষাকৃত নতুন বহুমুখী বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হল মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান—সংক্ষেপে ইংরেজি আদ্যক্ষর নিয়ে যাকে বলা হয় স্পার্সো (SPARRSO)। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি অতি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবির সাহায্যে ভূ-সম্পদ জরিপ, আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়ার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে; কৃষি, বনসম্পদ, পানিসম্পদ, মৎস্য চাষ, সমুদ্র সম্পদ ও ভূতত্ত্ব এমনি নানা ক্ষেত্রে এসব গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসাক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি অবদান আন্তর্জাতিক সাড়া জাগিয়েছে। সেটি হল ঢাকার আন্তর্জাতিক উদরাময় কেন্দ্র উদ্ভাবিত লবণ-চিনির শরবত; এর সাহায্যে কলেরা-ডায়রিয়ায় মৃত্যুর হার শতকরা একভাগে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতি পৃথিবীর বহু দেশে আজ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া কিডনি রোগ, হৃদ্‌রোগ, ক্যানসার প্রভৃতি চিকিৎসার আধুনিক ব্যবস্থা বিভিন্ন হাসপাতালে গড়ে উঠেছে। তবে সে সব এখনও তেমন নির্ভরযোগ্যতা অর্জন না করায় এদেশের বহু মানুষকে আজ উন্নত চিকিৎসার জন্য আশপাশের দেশে পাড়ি জমাতে হচ্ছে।

এযাবৎ মূলত ফলিত বা প্রয়োগমুখী গবেষণার কথাই উল্লেখ করা হল। তা বলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক গবেষণা চলছে তার মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ই বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ফলিত গবেষণায় জড়িত রয়েছে। কিন্তু মৌলবিজ্ঞানের বলিষ্ঠ কাঠামো ছাড়া বর্তমান যুগে ফলিত গবেষণা নিষ্ফল হবার সম্ভাবনা। এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নত মানের বিজ্ঞান শিক্ষা ও মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর্যাপ্ত আয়োজন একান্ত জরুরি।

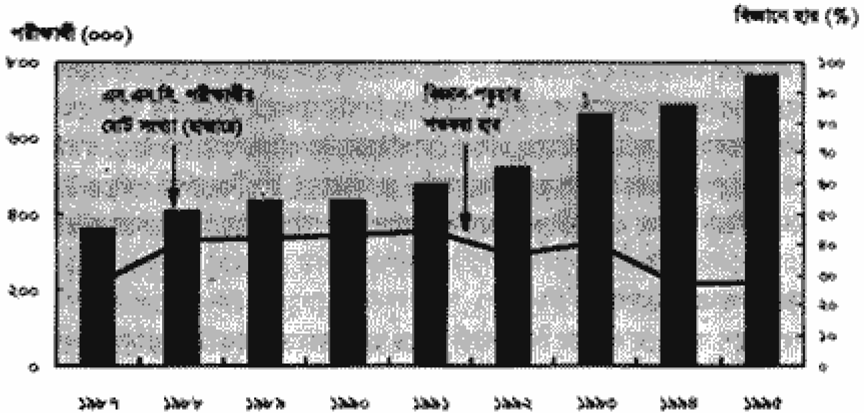
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষা

বাংলাদেশে আজ যে ধরনের বিজ্ঞানচর্চা চলছে তা স্বভাবতই একটি স্বল্পোন্নত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নানা সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত। তার মধ্যে একটি হল দেশে বিজ্ঞানচর্চার কোন দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে সেই ঔপনিবেশিক যুগেও এদেশের অগ্রণী সংস্কৃতিনায়করা দেশের অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান গবেষণার অপরিহার্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তারই ফলে বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালিদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞানচর্চায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭), প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) এঁদের নাম সবার জানা। দুঃখের বিষয় দারিদ্র, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহা এসব কারণে কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

(১৯০০-১৯৭৭) প্রমুখ দু'চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া সেকালে মুসলমান সমাজে তেমন কেউ বিজ্ঞানচর্চায় এগিয়ে আসেন নি। তার ফলে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানীদের অনেকে দেশ ছেড়ে যাওয়ায় এ অঞ্চলে সাময়িক এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তারপর থেকে অবশ্য পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে এসে বিজ্ঞান শিক্ষা আর বিজ্ঞানচর্চার প্রসার খুব ধীরগতিতে এগিয়েছে।

এই ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে আজও বাংলাদেশে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা বেশ নিচু মানের; এ পরিস্থিতি এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বড় মাপের বাধা হয়ে রয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আর যেসব বাধা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ করা যায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অপর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ, বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলির ব্যবস্থাপনার দৈন্য, বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফলকে শিল্পপণ্যে রূপান্তরের উপযোগী কাঠামোর অভাব এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগে যথোপযুক্ত প্রেষণার অভাব। এই প্রেষণা ও উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার কারণেই দেশের উচ্চমানের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অনেকে বিদেশে কাজের সুযোগ পেলে আর দেশে ফিরতে তেমন আগ্রহ বোধ করেন না।

এস.এস.সি.-তে মোট পরীক্ষার্থী বাড়ছে: কিন্তু বিজ্ঞানে হার কমছে



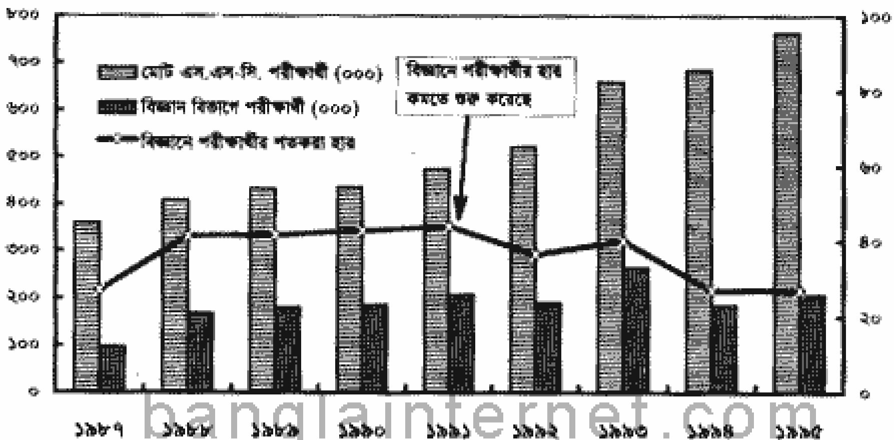
এদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয় ষাটের দশকের শুরুতে; তারপর মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে অংশগ্রহণকারীর হার ক্রমে ক্রমে বেড়ে আশির দশকের শেষে চল্লিশ শতাংশের ওপর উঠেছিল, কিন্তু নব্বইয়ের দশকে তা আবার কমে গিয়ে ২৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। স্কুল পর্যায়ে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয় তাতে পরীক্ষায় নম্বর তোলার জন্য তথ্য গলাধঃকরণের ওপর যতটা জোর সে তুলনায় বিজ্ঞানের মূল চরিত্র অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়মের উপলব্ধি ও তার প্রয়োগকুশলতা অর্জনের

দিকে মনোযোগ অনেক কম। দেশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনে উৎসাহ দেবার জন্য প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ এডুকেশনাল ইকুইপমেন্ট বোর্ড (BEEB) নামে একটি সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সেটাকে অপ্রয়োজনীয় বলে তুলে দেওয়া হয়েছে। এধরনের পদক্ষেপকে অনেকেই দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত বলে গণ্য করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মূলত দেশের উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ জনশক্তি তৈরি এবং মৌলিক গবেষণা পরিচালিত হয়। স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্যা, দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রায় তেমনি। দেশের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ প্রায় ৭৬,০০০ এবং তাদের মধ্যে মোটামুটি পঁচিশ শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রায় ছ'শ ডিগ্রি কলেজ রয়েছে (তার দু'-তৃতীয়াংশই বেসরকারি); ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে অর্ধেকের কম কলেজে। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া রয়েছে চারটি ডিগ্রি পর্যায়ের ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, একটি স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানসহ ১৮টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আর তিনটি কৃষি কলেজ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডিগ্রি দেয় বলেই যে সে ডিগ্রিধারীরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে পেশাগত কাজে নিয়োজিত হতে পারে তা অবশ্য নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীসংখ্যা দীর্ঘকাল ধরে নির্দিষ্ট অঙ্কে সীমিত থাকার ফলে নতুন নিয়োগের সুযোগ অতি সামান্য। তার ফলে বিজ্ঞানের অনেক ডিগ্রিধারীকেই আজ নিজের বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে নানা পেশায় নিয়োজিত হতে হচ্ছে অথবা বেকারত্ব বরণ করতে হচ্ছে। এসব কারণে কলেজগুলিতে বিজ্ঞান-

মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থীর হার কমে যাচ্ছে



পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নমুখী। ব্যানবেইস পরিচালিত শিক্ষাশুমারি ১৯৯৩ থেকে জানা যায় সে বছর এস.এস.সি.-তে বিজ্ঞান-পড়ুয়ার হার ছিল ৩১.১ শতাংশ, এইচ.এস.সি.-তে সেটা কমে হয় ১৪.৬ শতাংশ, আর ডিগ্রি স্তরে এই হার আরো নেমে আসে মাত্র ৫.৩ শতাংশে। অথচ সত্তর দশকে ডিগ্রি স্তরে বিজ্ঞান-পড়ুয়া শিক্ষার্থীর হার ছিল ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ; আমাদের আশপাশের অনেক দেশে এই হার ৫০ শতাংশের ওপরে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা ধরনের গবেষণা প্রকল্পের জন্য অনুদান দেয় মাত্র দশ-পনের লক্ষ টাকা। অর্থাৎ গবেষণার জন্য সাকল্য বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য মোট বরাদ্দের মাত্র হাজার ভাগের এক ভাগ। এ ধরনের বরাদ্দের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উঁচু মানের গবেষণা পরিচালনা করবে বা গবেষণাকর্মী সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-গবেষণার পরিস্থিতি নিয়ে গত কয়েক দশকে বেশ ক'টি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এসব সমীক্ষার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হয়েছে যে, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে অনুন্নত দেশগুলিতে মোট জাতীয় উৎপাদনের অন্তত এক শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ব্যয় করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে গত দু'যুগ ধরে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ এর ধারেকাছেও যায় নি। তার ফলে অধিকাংশ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আজ মোট বাজেট বরাদ্দের প্রায় নব্বই শতাংশ বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় করতে হয়; প্রকৃত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের জন্য অতি সামান্য অর্থই ব্যয় করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দের দৈন্য স্বভাবতই বিজ্ঞানচর্চায় আরো নানা আনুষঙ্গিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে উপকরণ, জনশক্তি, পুস্তক ও সাময়িকী ইত্যাদি নানা অনটন। বর্তমানে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ যেখানে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে মোট জাতীয় উৎপাদনের ০.৫ থেকে.৮ শতাংশ বরাদ্দ করে সেখানে আমাদের বরাদ্দ মাত্র ০.০৪ শতাংশ।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির জন্য শুধু গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দই যথেষ্ট নয়। এজন্য জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে (যেমন খাদ্য, জনসংখ্যা, পানি, শক্তি প্রভৃতি) গবেষণার অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সে সব ক্ষেত্রে দক্ষ গবেষণা-জনশক্তি ও তাদের নিবেদিত সাধনা এবং এসব গবেষণার ফলাফল ব্যবহারিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের গবেষণা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং এই কর্মকাণ্ডেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল যেমন সমগ্র দেশের সমৃদ্ধির কারণ হতে পারে তেমনি সমগ্র জনসমাজের সমর্থন ও সহযোগিতাও সফল গবেষণার জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সকল গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয়ের জন্য ১৯৭৫ সালে প্রথম একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিষদ গঠন করা হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে এর কাঠামো পরিবর্তিত হলেও দীর্ঘকাল দেশের রাষ্ট্রপতি এর প্রধান থেকেছেন এবং সদস্য হিসেবে রয়েছেন নানা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব এবং প্রধান প্রধান বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানিবৃন্দ। এই পরিষদের পক্ষ থেকে একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ১৯৮৬ সালে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের উন্নয়ন। এতে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় তার মধ্যে একটি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে যথেষ্ট আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা; আরেকটি হল এক্ষেত্রে উপযুক্ত জনসম্পদ গড়ে তোলা ও তাঁদের গবেষণাকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা ও পরিবেশ সৃষ্টি। এই নীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তত এক শতাংশ (অথবা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পাঁচ শতাংশ) বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মোট বাজেটের শতকরা অন্তত ০.৫ ভাগ গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করবে এমন প্রস্তাবও করা হয়েছিল। এই নীতি অনুসরণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি করা হলে তা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করত। কিন্তু গত এক দশকে এই নীতি বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নীতি ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বিজ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু শেষ বিচারে বিজ্ঞানচর্চা বিজ্ঞানীদেরকেই করতে হয়। এক্ষেত্রে তাঁদের পেশাগত বা বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ ও গবেষণাকর্মের বিষয়ে মতবিনিময়ের জন্য গবেষণা-পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনাচক্র, সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁরা বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন। এদেশের বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে বিদেশের বিজ্ঞানীদের যোগাযোগ ও মতামত বিনিময়ও এসবের মাধ্যমে ঘটতে পারে। এদেশে আজ বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী, বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, পদার্থবিদ্যা সমিতি, রসায়ন সমিতি, উদ্ভিদবিদ্যা সমিতি, প্রাণিবিদ্যা সমিতি প্রভৃতি অন্তত অর্ধশত বিশেষজ্ঞ সমিতি চালু আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পত্রপত্রিকার সংখ্যাও মোটামুটি একশ ; অবশ্য তার মধ্যে অনেকগুলিই তেমন নিয়মিত নয়।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে। এদিক দিয়েও বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির সারিতে। সাধারণ মানুষ দূরের কথা এমন কি দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি আজও দুনিয়া জোড়া ইন্টারনেট সংযোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নি। তবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ ও ব্যাঙ্কডক-এ বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্নিবেশন ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে।

আরো বড় উদ্যোগ দরকার

বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের অভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। তার বিপরীতে এদেশের তরুণ সমাজের মধ্যে এক ব্যাপক বিজ্ঞান-চেতনার প্রকাশ আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এসব তরুণ স্বাধীনতার পরপরই দেশে অসংখ্য অপেশাদার বিজ্ঞান-ক্লাব গড়ে তুলতে আরম্ভ করে। তাদের উৎসাহ দেবার জন্য ১৯৭৮ সাল থেকে জাতীয় পর্যায়ে বার্ষিক বিজ্ঞান সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর এই উদ্যোগে দেশের নানা প্রান্তে ছড়ানো প্রায় চারশ' বিজ্ঞান ক্লাবের তরুণ উদ্ভাবক ও বিজ্ঞানোৎসাহী সাগ্রহে অংশ নিয়ে থাকে। এই আয়োজনে বিজ্ঞানী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

সারা পৃথিবীর প্রায় দু'শ রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশ আজ একেবারে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে। এ বিষয়ে আজ আর কারো কোন সংশয় নেই যে, কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক চর্চা আর প্রয়োগই এদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে নিতান্ত কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ এ যাবৎ নেয়া হয়েছে। দেশের কৃষি-উৎপাদন আরো ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে; জ্বালানি সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন নতুন শক্তির উৎস কাজে লাগাতে হবে; গবেষণার মাধ্যমে দেশজ সম্পদ ব্যবহারের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

আধুনিক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স, জৈব-প্রযুক্তি, জিন-প্রকৌশল প্রভৃতি উদ্ভাবন যোগাযোগ, উৎপাদন ও জীবনযাত্রার সামগ্রিক মানে বিপুল অবদানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এসব সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার না করলে সভ্যতার নিরন্তর অগ্রযাত্রায় আমরা কেবলই পিছিয়ে পড়তে থাকব। এজন্য যেমন দেশব্যাপী উপযুক্ত জনসম্পদ সৃষ্টির ব্যাপক আয়োজন চাই, তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ বিনিয়োগও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

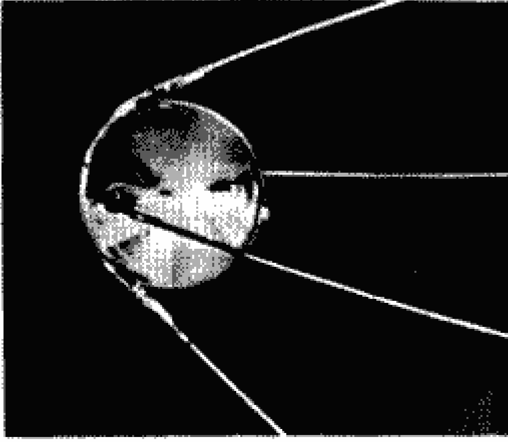
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করে তাকে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে না নিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় ভোগের সামগ্রী উৎপাদনের কৌশল হিসেবে দেখার একটি অসুস্থ প্রবণতা এদেশের নীতিনির্ধারক মহলের একাংশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেশের ব্যাপক জনসমাজকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে এবং মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি হিসেবে নিয়ে আগামী একুশ শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করা আদৌ সম্ভব নয়। বিজ্ঞানকে সমগ্র জনসমাজের চেতনায় স্থাপন করার জন্য এদেশের শিক্ষা ও গবেষণা-কাঠামোয় ব্যাপক ও মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজন হবে। আর কেবল এভাবেই দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যে প্রাথমিক কাঠামো আজ গড়ে উঠেছে তার ব্যাপক বিকাশ ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমগ্র জনসমাজের আর্থসামাজিক রূপান্তর সাধন সম্ভব হতে পারে।

মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখা

আমাদের পৃথিবীর ওপর যে আকাশ তার সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল চিরকালের। এই আকাশে লুকানো আছে কত যে রহস্য তার লেখাজোখা নেই। আর সেসব রহস্য ভেদ করাও সহজ ব্যাপার নয়। কেমন করে গিয়ে পৌঁছনো যাবে সে আকাশে— মর্ত্যের মানুষের কাছে তো নেই পুষ্পক রথ অথবা বোর্‌রাক! আকাশ জুড়ে যে তারার মেলা তার কিভাবে সৃষ্টি হল; আকাশে যে তেজঢালা সূর্য সেটা আসলে কী; সূর্য আর পৃথিবীর জন্মই-বা কী করে হল—এসব প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়েছে বহু হাজার বছর ধরে। পৃথিবীর ওপরে থেকেই মানুষ জানতে চেষ্টা করেছে আকাশের নানা বিষয় নিয়ে।

এদিকে বড় রকম অগ্রগতি হয় আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে। ১৬০৯ সালে ইতালিতে গ্যালিলিও তৈরি করলেন প্রথম টেলিস্কোপ বা দূরবীন যন্ত্র। এই দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখা গেল চাঁদের ওপর পাহাড় আর খাদ, সূর্যের গায়ে কলঙ্ক, বৃহস্পতি গ্রহের চারপাশে চারটি উপগ্রহ। মানুষের চোখের সামনে দূরের মহাকাশের এক আশ্চর্য নতুন ধরনের ছবি ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল। গ্রহ-উপগ্রহদের গতিবিধি আর গণিতের আঁকজোখ থেকে কোপার্নিকাস-কেপলার প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণা এ সত্য আগেই আবিষ্কার করেছিল যে, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র নয়, পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। গ্যালিলিওর দূরবীন তা যেন মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে দূরবীনের শক্তি বাড়তে থাকল, তেমনি বাড়তে লাগল মহাকাশ গবেষণার ব্যাপ্তি, গণিতের হিসেব-নিকেশের সূক্ষ্মতা। মহাকর্ষের মহাসত্য উদ্ঘাটন করলেন সতের শতকের শেষভাগে আইজাক নিউটন। তাতেই প্রথম বোঝা গেল কি করে মহাকাশে কোন অবলম্বন ছাড়া নিয়মিত পথ ধরে যুগ যুগ ধরে ঘুরছে নানা গ্রহ-উপগ্রহ, তারার পুঞ্জ।

বিশ শতকের শুরুতে এসে মহাকাশ গবেষণা পেল আরো নতুন মাত্রা। আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন আপেক্ষিকতার যুগান্তকারী তত্ত্ব। তার কিছুদিন পরই জানা গেল আকাশের তারাপুঞ্জ যেন সব কেবলই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছুটে যাচ্ছে। তাতে মনে হয় মহাবিশ্ব যেন একটা ফুঁ দিয়ে ফোলানো বেলুনের মতো কেবলই ফেঁপে উঠে বড় হচ্ছে— তাতেই তার ওপরকার তারার দল ক্রমাগত সরে যাচ্ছে একে অন্য থেকে।



● *পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ — স্পুৎনিক। এর আকার ছিল বলের মতো; ব্যাস ৫৮ সে.মি. আর ওজন মাত্র ৮৩.৬ কেজি।*

রকেটে চেপে মহাকাশে

কিন্তু মানুষ আকাশে ওড়ার স্বপ্ন ছাড়ে নি। আঠার শতকের শেষ থেকে মানুষ আকাশে ওঠার চেষ্টা করেছিল বেলুনে চেপে। কিন্তু তাতে বেশি দূর ওঠা যায় না। বিশ শতকের শুরুতে আমেরিকায় অরভিল আর উইলবার রাইট নামে দু'ভাই আকাশে ওড়ার যন্ত্র বানিয়ে ফেলল। সে উড়োজাহাজে চেপে যাওয়া যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়; কিন্তু তাও তো বাঁধা পৃথিবীর আকর্ষণের টানে, আর ওড়ে বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে! আরো অনেক উঁচু থেকে মহাকাশের খবর যোগাড় করা দরকার। আকাশের অনেক উঁচুতে উঠতে হলে চাই মহাশূন্যে চলতে পারে এমন রকেট যান।

এতদিন মানুষকে মহাকাশের প্রায় সব মাপজোখ নিতে হত পৃথিবীর ওপর থেকে। এবার রকেট যানে করে পরিমাপের যন্ত্রপাতি পাঠানো গেল বায়ুমণ্ডলের অনেক উঁচুতে। অবশেষে ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর পরীক্ষার যন্ত্রপাতিসহ একটি গোলক রকেটের সাহায্যে ছুঁড়ে পাঠানো হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরে— সেটি হয়ে গেল পৃথিবীর এক কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুৎনিক। সেই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ছিল একটা গোল বলের মতো; তার ব্যাস মাত্র ৫৮ সে.মি. অর্থাৎ দু'ফুটের কাছাকাছি, আর তার ওজন ছিল মাত্র ৮৩.৬ কেজি অর্থাৎ সোয়া দু'মনের মতো। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ইউরি গাগারিন নামে এক দুঃসাহসী তরুণ রুশ বৈমানিক এমনি রকেট যানে চেপে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে এল 'ভোস্তক-১' নামের প্রায় পাঁচ টন ওজনের বেশ বড়সড় আকারের নভোযানে।

তারপর থেকে শুধু পৃথিবীর চারপাশে নয়, সৌরজগতের দিকে দিকে নভোযানের সাহায্যে মানুষের অভিযাত্রা এগিয়ে চলেছে। ১৯৬৯ সালে মানুষ গিয়ে পৌঁছেছে চাঁদে— সেখানে বসানো হয়েছে মহাকাশ সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহের নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। নভোযানে চেপে মানুষ মাসের পর মাস—এমন কি এক বছরের বেশি সময় কাটিয়েছে মহাকাশে— সেখানে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। নভোযানের

সাহায্যে নানা বিশেষ ধরনের পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বসিয়ে রেখেছে আকাশের অনেক উঁচুতে। সেসব থেকে অনবরত মহাকাশের নানা তথ্য এসে পৌঁছচ্ছে পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের কাছে।

মহাকাশের খবরাখবর নেবার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল সত্তর আর আশির দশকে ভয়েজার নভোযানের অভিযান। ১৯৭৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে 'ভয়েজার' বা অভিযাত্রী নামে যন্ত্রপাতিতে ঠাসা একেকটি প্রায় এক টন ওজনের দু'টি নভোযান পাঠানো হয় বৃহস্পতি গ্রহের দিকে— কিছুটা পৃথক পথে। প্রায় দেড় বছর একটানা মহাকাশে ছোটার পর ভয়েজার-১ বৃহস্পতির কাছ দিয়ে ছুটে চলে যায়। চার মাস পর ভয়েজার-২ও এভাবে পাশ কেটে যায় বৃহস্পতিকে। যাবার সময় দুটি নভোযানই বেতারযোগে বিজ্ঞানীদের কাছে বৃহস্পতির অনেক ছবি আর নতুন নতুন খবরাখবর পাঠায়।

ভয়েজার নভোযান দু'টি ১৯৮০-৮১তে শনি, ১৯৮৬ সালে ইউরেনাস আর ১৯৮৯ সালে নেপচুন গ্রহের পাশে গিয়ে পৌঁছয়। তারপর প্লুটোর কক্ষপথ পেরিয়ে পাড়ি জমায় সৌরজগতের আরো অতি দূর প্রান্তে। এসব নভোযান থেকে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের আশ্চর্য স্পষ্ট সব ছবি পাওয়া গিয়েছে; অনেকগুলি নতুন নতুন উপগ্রহের খোঁজ মিলেছে; আর জানা গেছে নানা আশ্চর্য অজানা তথ্য। যেমন, এই প্রথম জানা গেল বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিড সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ; এটি মাপে বুধ গ্রহের চেয়েও বড়। ভয়েজারের পাঠানো ছবিতে বোঝা গেল অতি শীতল গ্রহ বৃহস্পতির উপগ্রহ আইও-র বুকে এখনো আগ্নেয়গিরির উদ্গার ঘটে চলেছে।

শুধু গ্রহজগৎ নয় মহাকাশের নক্ষত্রজগতের তথ্য সংগ্রহের জন্য সম্প্রতি নতুন নতুন ধরনের পরিমাপের যন্ত্রপাতি মহাকাশে বসানো হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপন করা হয়েছে হাব্‌ল্ নামে মহাকাশ দূরবীন। ২.৪ মিটার ব্যাসযুক্ত প্রতিফলকসহ এই দূরবীনের মোট ওজন এগার টনের ওপর—পৃথিবীর ৬০০ কিলোমিটার ওপর থেকে এটি ক্রমাগত মহাকাশের নানা বস্তুর অতি সূক্ষ্ম ছবি নিয়ে চলেছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে যেসব আলো ও অন্যান্য বিকিরণ এসে পৌঁছয় সেগুলো নানাভাবে বিকৃত হয়। বায়ুমণ্ডলের ওপরে বলে হাব্‌ল্ দূরবীনে পৌঁছচ্ছে অবিকৃত বিকিরণ। দূরবীনটি তৈরির সময় কিছুটা ত্রুটি ঘটায় প্রথম দিকে এটি পুরোদস্তুর কাজ করতে পারছিল না, পরে ক'জন নভোচর স্পেস শাট্‌ল্ বা মহাকাশ ফেরিতে করে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সেখানে পৌঁছে সে ত্রুটি মেরামত করেছেন। মানুষের চোখ যত মৃদু আলোতে দেখতে পায় হাব্‌ল্ তার চেয়ে পাঁচ কোটিগুণ মৃদু আলোর ছবিও তুলতে পারছে।

মহাকাশ থেকে পৃথিবীর খবর

কিন্তু মহাকাশে বসানো নভোযান থেকে মানুষ যে কেবল বাইরের বিশ্বলোকের খবরাখবর সংগ্রহ করছে তা তো নয়। বাইরে থেকে মানুষ তাকাচ্ছে তার অতি প্রিয়

পৃথিবীর দিকেও। আর এভাবে পৃথিবী সম্বন্ধেও সংগ্রহ করা যাচ্ছে অনেক নতুন খবর—এমন সব খবর যা এতদিন পৃথিবীর ওপর থেকে সংগ্রহ করা ছিল দুঃসাধ্য।

মানুষ তার চারপাশের বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। প্রকৃতির অনেক উপকরণের নতুন নতুন ব্যবহার আবিষ্কার করেছে, প্রকৃতির অনেক শক্তিকে জয় করে নিজের কাজে লাগিয়েছে। তবু প্রকৃতির কিছু কিছু ভয়াল শক্তিকে মানুষ এখনো জয় করতে পারে নি; সে সবকে জয় করার জন্য তার অব্যাহত সাধনা চলেছে। এ ধরনের শক্তির নমুনা হল সাইক্লোন আর ভূমিকম্প।

পৃথিবীতে মানুষ চারপাশের পরিবেশে যতটুকু এলাকায় অনুসন্ধান চালাতে পারে সে এলাকাটা এই বিশ শতকের শুরুতেও ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। ভূপৃষ্ঠের তলায় মাত্র কয়েকশ' ফুট (অর্থাৎ খনির তলায় যতদূর যাওয়া যায়), আর পৃথিবীর ওপর ছিল মাত্র কয়েক হাজার ফুট— বেলুন বা উড়োজাহাজে যতদূর উঁচুতে ওঠা যায়। ১৯৫৭ সালে মহাকাশে প্রথম নভোযান স্থাপন করার পর দেখতে দেখতে সে অবস্থা অনেকটা বদলে গেল। গাগারিনের প্রথম মহাকাশ ভ্রমণের পরপরই ৬ আগস্ট ১৯৬১ ভোস্তক-২ নামের নভোযানে আকাশে উঠলেন হারমান তিতভ। তিনিই প্রথম মহাকাশ থেকে ছবি তুললেন পৃথিবীর। তারপর আরো চারটি ভোস্তক ওড়ে আকাশে আর পৃথিবীর সম্বন্ধে সংগ্রহ করে নানা খবর। এভাবে তখন থেকে মানুষ যন্ত্রপাতিতে ভরা নভোযানে চেপে উঠতে লাগল আকাশের অনেক উঁচুতে; সেখান থেকে দূর-অনুধাবনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে লাগল পৃথিবীর নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিপুল পরিমাণ তথ্য— ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন সম্বন্ধে আগাম খবর, তার গতিবিধির নাড়িনক্ষত্রের তথ্যও পড়ে তার মধ্যে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে এদেশের নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে বন্যা, সাইক্লোন এসব নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বর্ষাকালে প্রতি বছরই দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা ডুবে যায় বানের পানিতে; কোন কোন বছর প্রবল বন্যায় তলিয়ে যায় দেশের তিন-চতুর্থাংশ। ছোট-বড় দু'চারটি সাইক্লোন প্রতি বছরই হানা দেয় এদেশের দক্ষিণের উপকূল অঞ্চলে— কোন কোন বছর প্রবল সাইক্লোন এসে তছনছ করে দেয় বিশাল এলাকা। তাতে নষ্ট হয় ফসল, ভাঙে মানুষের ঘরবাড়ি, প্রায়ই নষ্ট হয় প্রচুর গবাদিপশু, গাছপালা, অসংখ্য মানুষের জীবন। এসব দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য দূর-অনুধাবন প্রযুক্তি আজ মানুষের হাতে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এই প্রযুক্তি এদেশে প্রথম আসে ১৯৬৮ সালে— যখন ঢাকায় পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রে একটি স্বয়ংক্রিয় চিত্র প্রেরণ (এ.পি.টি. বা অটোমেটিক পিকচার ট্রান্সমিশন) কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। মহাকাশে বসানো আবহাওয়া উপগ্রহ পৃথিবীপৃষ্ঠের আলোকচিত্র তুলে পাঠালে তা এই কেন্দ্রে গ্রহণ করা যায়। সে সময়ে পরমাণু-শক্তিকেন্দ্রে যে 'মহাকাশ ও আবহাওয়া গবেষণাকেন্দ্র' স্থাপন করা হয় তাতেই এসব চিত্র বিশ্লেষণ করা হত। ১৯৭০ সালের ১১-১২ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে যে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন হানা দিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটায়, এই কেন্দ্র

নোআ (NOAA) কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের বন্যাকবলিত এলাকার দৃশ্য: ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।

তার সঠিক আগাম খবর দিয়েছিল; কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে সে সময়ে এই আগাম খবর ঠিকমতো কাজে লাগানো যায় নি।

সত্তরের দশকের শুরুতে (১৯৭২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে ভূসম্পদ-প্রযুক্তি-উপগ্রহ স্থাপন করে; তার নাম দেয়া হয় ল্যাণ্ডস্যাট-১। এই উপগ্রহের তথ্য নিয়ে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ ল্যাণ্ডস্যাট কর্মসূচি চালু হয়। অবশেষে ১৯৮০ সালে এই দু'টি কর্মসূচি একত্রে যুক্ত হয়ে মহাকাশ গবেষণা ও দূর-অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO) গড়ে ওঠে। ঢাকার আগারগাঁ এলাকায় তার জন্য নতুন ভবন স্থাপন করা হয়। এই স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা সংস্থাটি গত ক'বছরে ভূসম্পদ জরিপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আবহবিদ্যা, কৃষি, বন, ভূতত্ত্ব, পানিসম্পদ, মৎস্যবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেকগুলি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছে। এছাড়া অন্য বহু গবেষণা ও উন্নয়নপ্রতিষ্ঠানের দূর-অনুধাবন সংক্রান্ত কাজেও স্পার্সো সহায়তা দিচ্ছে। এই সংস্থা ১৯৮৫ ও ১৯৯১-এর সাইক্লোন এবং ১৯৮৭ ও ১৯৮৮-র প্রবল বন্যার সময় জাতীয় দুর্যোগকালে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

স্পার্সো এর মধ্যে ঢাকা ও সাভারে মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দু'টি গ্রাহক-কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এর মধ্যে একটি হল উন্নত আবহাওয়াগত ভূউপগ্রহ কেন্দ্র। এতে মার্কিন নোআ (NOAA) ও জাপানি জিএমএস (GMS) কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্য থেকে বাংলাদেশ ও তার আশপাশের নানা পরিবেশগত উপাত্ত নিয়ে তাকে কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। অন্য কেন্দ্রটি হল স্পট ও ল্যাণ্ডস্যাট কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য—এটি স্থাপন করা হয়েছে ঢাকা থেকে ৪০ কি.মি. উত্তরে সাভারে। এই কেন্দ্রটি নানা সমস্যার কারণে আজো পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয় নি। এছাড়াও অন্য দেশের কাছ থেকেও স্পার্সো বিপুল পরিমাণ কৃত্রিম উপগ্রহ তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে। সম্প্রতি এখানে একটি GIS (Geographic Information System) বা ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে ; তা অনেক প্রতিষ্ঠানকেই দেশের সম্পদ অনুসন্ধানে, ভৌগোলিক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণার কাজে সহায়তা দিচ্ছে।

এক মহাঘূর্ণিঝড়

২৯ এপ্রিল ১৯৯১ রাতে বাংলাদেশের উপকূলে যে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানে তাকে এক মহাঘূর্ণিঝড় বলা যেতে পারে। এর আকার ছিল বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ। সন্দ্বীপে ঝড়ের সর্বোচ্চ বেগ মাপা হয় ঘণ্টায় ২২৫ কি.মি., তার পরপরই সেখানকার বায়ুবেগ মাপার যন্ত্রটি উড়ে যায়। নোআ-১১ উপগ্রহ চিত্র থেকে ঝড়ের বায়ুবেগ হিসেব করা হয়েছে ঘণ্টায় ২৪০ কি.মি.। স্পার্সো ২৩ এপ্রিল থেকেই এই ঝড়ের অগ্রগতি লক্ষ্য করতে থাকে এবং এর গতিবিধি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে জানাতে থাকে। ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় যখন ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে নিঝুম দ্বীপ, মনপুরা, ভোলা, সন্দ্বীপ এসব এলাকায় আঘাত হানে তখন ঝড়ের কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম

বন্দর থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে। ঝড়ের সময় সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস হিসেব করা হয়েছে ৬.১ থেকে ৭.৬ মিটার (২০-২৫ ফুট) উঁচু। এই ঝড়ে সম্পদ ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয়েছে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা। আর মানুষের মৃত্যু হিসেব করা হয়েছে মোটামুটি ১৩৮,০০০; তার মধ্যে উপকূল অঞ্চলের জেলে ছিল প্রায় ৪৬,০০০। ১৯৭০-এর সাইক্লোনের পর এই অঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। তাতে অনুমান করা যায় আগের সাইক্লোনে যেখানে পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল সেখানে ১৯৯১-এর সাইক্লোনে প্রায় দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হতে পারত। অর্থাৎ মহাকাশের তথ্যের ভিত্তিতে সময়মতো পূর্বাভাস দান আর সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলেই এই ঝড়ে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণ বেঁচেছে।

স্পার্সোর গবেষণার একটি বিশেষ দিক হল আবহাওয়া। বিগত দু'যুগ ধরে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে যতগুলি সাইক্লোন বয়ে গিয়েছে তার সবগুলির গতিপথ মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মহাকাশ থেকে আকাশের মেঘ-সমাবেশ সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগকে সরবরাহ করা হয়। বন্যার ভবিষ্যদ্বাণী ও সঙ্কেত দানের জন্য এসব তথ্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকেও সরবরাহ করা হয়। এসব তথ্য ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে বড় আকারের বন্যার সময় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাবার জন্য বিশেষভাবে কাজে এসেছিল।

আজকে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে দুনিয়াজোড়া আলোচনা চলছে। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়লে যেসব সমুদ্রতীরবর্তী দেশ প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সে কারণে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের পরিবেশ নিয়ে গবেষণা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় সারা পৃথিবীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। স্পার্সো এক্ষেত্রের গবেষণাতেও অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

স্পার্সোর কাজের আরেকটি বড় অংশ জুড়ে আছে কৃষি-সংক্রান্ত গবেষণা। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষি এদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মাটির প্রকৃতি, শস্য বোনার ধারা, ফলনের পরিমাণ, ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি এসব দূর-অনুধাবন প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। যেমন নোআ উপগ্রহের Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) এবং ল্যান্ডস্যাট উপগ্রহ থেকে যে উপাত্ত পাওয়া যায় তার সাহায্যে শীতকালীন বোরো ধানের ফলন হিসেব করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। তার ফলে মহাকাশের তথ্যের সাহায্যে ধান জমিতে থাকতেই বোরো ধানের থানাভিত্তিক ফলন হিসেব করা যাচ্ছে। তেমনি আমন ধানের উৎপাদনও ফসল জমিতে থাকতে থাকতেই কিভাবে হিসেব করা যায় তার পদ্ধতিও উদ্ভাবন করা হয়েছে।

উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনায়ন

মহাকাশ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বন, মৎস্য, মানচিত্র প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রচুর গবেষণা চলছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে ভাঙন ঠেকানো

এবং ভূমিকে দৃঢ়তা দানের জন্য বৈদেশিক সহায়তায় ব্যাপক বনায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তাতে ম্যানগ্রোভ, বাবলা, কেওড়া, বায়েন, কাঁকড়া, গোলপাতা এসব গাছ লাগানো হচ্ছে। এধরনের বনায়নের ফলে উপকূলে পলি পড়া ত্বরান্বিত হয়ে নতুন জমি জেগে উঠছে; তাছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সময় হাওয়া-পানির প্রকোপ কমাতেও তা সাহায্য করছে।

এসব প্রকল্পের অংশ হিসেবে মহাকাশ থেকে বড় মাপের ছবি তুলে তার সাহায্যে সমগ্র উপকূল অঞ্চলের বনায়নের আগের ও পরের অবস্থার মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৮০-৮৫ সালে উপকূল অঞ্চলে প্রায় ৮৯,০০০ একর বনায়ন করা হয়েছিল। উপগ্রহের তথ্যের সাহায্যে জরিপ চালিয়ে দেখা যায় পাঁচ বছর পর তার মধ্যে মোটামুটি অর্ধেক গাছ টিকে ছিল। এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮৫-৯০ সালে উপকূল অঞ্চলে আরো প্রায় ৭৭,০০০ একর বনায়ন করা হয়। উপগ্রহের জরিপ থেকে দেখা যায় তার মধ্যে ষাট শতাংশের মতো টিকে ছিল। প্রায় ত্রিশ শতাংশ এলাকা ছিল এমন বৃক্ষশূন্য যে সেখানে আদৌ কোন বনায়ন হয়েছে কি না তা বোঝা শক্ত।

দেশের নানা জলাজমিরও এভাবে ছবি নেওয়া হচ্ছে এবং উপকূল অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ও অন্যান্য অঞ্চলে মাছ ধরার এলাকা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের পানির নানা ভৌত গুণাগুণের পরিবর্তন, যেমন তাপমাত্রা, পানির সঞ্চালন, স্বচ্ছতা, তলানির চলাচল ইত্যাদি উপগ্রহ তথ্যের সাহায্যে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এধরনের একটি গবেষণার তথ্য থেকে দেখা যায় চকোরিয়া সুন্দরবন এলাকায় সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সাড়ে সাত হাজার হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন ছিল; তা ক্রমে ক্রমে প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে তার জায়গায় আজ সমগ্র এলাকায় চিংড়ির চাষ গড়ে উঠেছে। এতে গুটিকতক চিংড়ি চাষীর প্রচুর মুনাফার সুযোগ ঘটলেও সমগ্র এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে; ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে এই এলাকার ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা আজ অনেক বেড়ে উঠেছে।

উন্নত দেশগুলি আজ খনিজ সম্পদের সন্ধান, সমুদ্রে মৎস্যসম্পদের জরিপ, জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বনসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষা এমনি নানা কাজে দূর-অনুধাবন প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাচ্ছে। পৃথিবীর নানা বস্তুসম্পদের আরো নিখুঁত আর নিরবচ্ছিন্ন হদিস করার জন্য তারা আজ স্থায়ী মহাকাশ কেন্দ্র তৈরি করে তাতে বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলীদের স্থাপন করার আয়োজন করছে।

এমন ব্যাপক আকারে না হলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় স্পার্সো ইতোমধ্যে বেশ কতকগুলি গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে আধুনিক মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে স্পার্সো শুধু যে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমানের উন্নয়নেই সহায়তা করছে তা নয়, পৃথিবীর এই অঞ্চলের অগ্রগতিতেও এসব গবেষণা অবদান রাখছে। যে প্রযুক্তি আজ আমাদের হাতের মুঠোয় তাকে কি করে আমরা এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো বেশি করে কাজে লাগাতে পারি তার কথা আমাদের সবাইকেই ভাবতে হবে।

শতাব্দীশেষের পূর্ণগ্রাস

বাংলাদেশ থেকে দৃশ্যমান শতাব্দীর শেষ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটে গেল ২৪ অক্টোবর ১৯৯৫ তারিখে। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সূর্যগ্রহণ ঘটছে প্রতি বছরই। কিন্তু গ্রহণের সময় পৃথিবীর ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া সূর্যের ছায়া পড়ে একটা অপেক্ষাকৃত সরু ফিতের মতো জায়গার ওপর দিয়ে; এসব জায়গা থেকেই কেবল সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গা যেহেতু সমুদ্র আর বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত আর মরুভূমিতে ঢাকা তাই জনবহুল জায়গার ওপর দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়ার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বিরল। আরো বেশি বিরল হল পৃথিবীর কোন একটি জায়গা থেকে পরপর দু'বার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া। বাংলাদেশ থেকে শেষবার এমনি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল ১৯৮০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে; এরপর আবার দেখা যাবে ২০০৯ সালের ২২ জুলাই ভোরে। তিন দশকের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তিন তিনবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া এদেশের বিজ্ঞানী আর প্রকৃতিপ্রেমিকদের জন্য একটা ভাগ্যের ব্যাপারই বলতে হবে।

কেন ঘটে সূর্যগ্রহণ

সূর্যগ্রহণ কিভাবে ঘটে তা স্কুলের বইতেই পড়ানো হয়; অবশ্য তা সত্ত্বেও মানুষের মনে এ সম্বন্ধে এখনও অনেক ভুল ধারণা রয়ে গিয়েছে। তাই সূর্যগ্রহণের সময় রাহু সূর্যকে গ্রাস করছে এবং এর মধ্যে নানা অমঙ্গলের বার্তা রয়েছে এরকম ধারণা অনেক শিক্ষিত লোককে আজও পোষণ করতে দেখা যায়। এধরনের ভয়-ভীতি অনেক পুরনো দিন থেকে চলে আসছে; তাই এসব মানুষের মন থেকে তাড়ানো খুব সহজ নয়। বিজ্ঞানের একটা কাজ হল মানুষকে অহেতুক ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা করা। এবারের সূর্যগ্রহণ এদেশের বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে এরকম ভয়-ভীতি দূর করার একটা চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছিল। আর তাঁরা যে এতে বেশ খানিকটা সফল হয়েছেন তা সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য আর এ সম্বন্ধে জানার জন্য লোকের বিপুল আগ্রহ থেকেই বোঝা যায়।

সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে মানুষের ভয় নিয়ে অনেক কাহিনী চালু আছে। তার মধ্যে একটি বিখ্যাত কাহিনী হল আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনরে

লিডিয়া-মিডিয়ার যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে। পশ্চিমে লিডিয়া আর পুবে মিডিয়া দু'রাজ্যের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে চলছে তুমুল লড়াই। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল আকাশ কালো করে অন্ধকার গ্রাস করছে সূর্যকে। ক্রমে ক্রমে পুরো সূর্যটাই ঢেকে গেল অন্ধকারে। এই বিষম দৈবদুর্যোগ দেখে দু'দলের সেনাদের আর তাদের সেনাপতিদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এই যুদ্ধের কারণে দেবতারা তাদের ওপর দারুণ রুষ্ট হয়েছেন। গ্রহণ এক সময় কেটে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে দু'দলের সেনাপতিরা দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে যার যার রাজ্যে ফিরে গেলেন।

এ কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। আজকের জ্যোতির্বিদরা হিসেব করে বের করেছেন এশিয়া মাইনরে এরকম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ লেগেছিল ৫৮৫ খ্রিস্টপূর্ব সালের ২৮ মে তারিখে। আর সেকালের বিখ্যাত গ্রিক পণ্ডিত থ্যালিস আগে থেকেই হিসেব করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ঐ তারিখে একটি সূর্যগ্রহণ ঘটবে। তার ফলে ধরা হয় যে, লিডিয়া-মিডিয়ার এই যুদ্ধই সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা আর থ্যালিস হলেন ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানী।

এই কাহিনীর একটা শিক্ষা হল সূর্যগ্রহণের কারণ মানুষ অন্তত আড়াই হাজার বছর আগেই বুঝতে পেরেছিল। আসলে তারও বেশ আগে সুমের দেশের জ্যোতির্বিদরা গ্রহণের কারণ বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। সুমের এলাকারই পরে নাম হয় ব্যাবিলনিয়া, তারপর ক্যালডিয়া, মেসোপটেমিয়া হয়ে আজ তার নাম হয়েছে ইরাক। ধারণা করা হয় যে, থ্যালিস যৌবনকালে ব্যাবিলনিয়া সফর করতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই তিনি শিখে আসেন সূর্যগ্রহণ কখন হবে সেটা আগে থেকে হিসেব করে বের করার নিয়মকানুন।

সুমের দেশের বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে, যখনই চাঁদে গ্রহণ লাগে তখন চাঁদ আর সূর্য থাকে পৃথিবীর দুই উল্টো দিকে; অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ার কারণেই চাঁদ অমন অন্ধকারে ঢেকে যায়। আবার সূর্যগ্রহণ যখনই হয় তখন চাঁদের থাকে অমাবস্যা। এতে বোঝা যায় সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য আর চাঁদ থাকে আকাশের একই জায়গায়, তাই সূর্য ঢাকা পড়ে যায় চাঁদের আড়ালে। সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহণের ব্যাপারে যে সব কথা জানতে পেরেছিলেন তা সাধারণ মানুষদের সহজে জানাতে চাইতেন না ; এসব কথা আগাম জানানো হত শুধু রাজা-রাজড়াদের— যাতে তাঁরা বিপদ ত্রাণের জন্য পুরোহিতদের দিয়ে নানা রকম পুজো-আর্চার ব্যবস্থা করেন। রাজারা এসব কথা জানতেন বলে সাধারণ মানুষ ভাবত তারা হল দেবতাদের বরপুত্র। আজ এ অবস্থা বদলে গিয়েছে। আজ বিজ্ঞানীরা যেসব কথা জানেন তা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন সবাইকে। তাই আজ স্কুলের ছেলেমেয়েরাও গ্রহণের নিয়মকানুনের কথা সব জানতে পারে।

আজ আমরা জানি যে, চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কখনো এসে পড়ে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে— একই সরল রেখার ওপরে। চাঁদ এসময়ে সূর্যের কাছাকাছি থাকে বলে তখন হয় অমাবস্যা ; তাই চাঁদকে পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া

যায় না। তবে চাঁদের ছায়া একটি শঙ্কুর মতো অন্ধকার এলাকা তৈরি করে আর তার ডগা পৃথিবীর গা ছুঁয়ে যায়। আর তখন এসব জায়গা থেকে সূর্য পুরোপুরি ঢেকে যায়। এই এলাকার বাইরের খানিক এলাকা দিয়ে সূর্যকে খানিকটা দেখা যায়; এসব জায়গায় হয় আংশিক সূর্যগ্রহণ। এবার ইরান থেকে শুরু হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যে এলাকার ওপর দিয়ে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে তা সবচেয়ে বেশি চওড়া ছিল মাত্র আশি কিলোমিটার।

সূর্য আর চাঁদের আকারের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাত: চাঁদের ব্যাসের চেয়ে সূর্যের ব্যাস প্রায় চারশ' গুণ বেশি। তবে সৌরজগতের এক আশ্চর্য গাণিতিক যোগাযোগের ফলে পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দূরত্ব তার চেয়ে সূর্যের দূরত্বও প্রায় এমনি অর্থাৎ চারশ' গুণ বেশি। এই আশ্চর্য কাকতালীয় যোগাযোগের ফলে পৃথিবী থেকে দেখলে সূর্য আর চাঁদ দুয়েরই আপাত আকার সমান ; আর এজন্যই পুঁচকে চাঁদের পক্ষে বিশাল সূর্যকে একেবারে ঢেকে ফেলা সম্ভব হয়। এখানে একটা সমস্যা হল পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের কক্ষপথ আর সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথ একেবারে বৃত্তাকার নয়, কিছুটা উপবৃত্তাকার। তার ফলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব আর পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব সব সময় হুবহু এক থাকে না, তাতে সামান্য হেরফের হয়। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের ছায়া যে শঙ্কু তৈরি করে তার দৈর্ঘ্য পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্বের চেয়ে সামান্য কম। তার ফলে পৃথিবী যখন তার কক্ষপথে সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি থাকে (যেমন ডিসেম্বর মাসে) আর চাঁদ যখন তার ঘোরাপথে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কাছে থাকে তখনই কেবল এই ছায়া পৃথিবীর গা ছুঁয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি হয়।

সমস্যার শেষ এখানেই নয়। চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে যে তল দিয়ে ঘোরে আর পৃথিবী সূর্যের চারপাশে যে তল দিয়ে ঘোরে তাও হুবহু এক নয়; দুয়ের মধ্যে রয়েছে সামান্য গরমিল। এই দুই তল শুধু অমাবস্যার সময় মাঝে মাঝে মিলে যায় আর তখনই সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবী এসে পড়ে একই সরল রেখার ওপর। এজন্যই প্রত্যেক চান্দ্র মাসে একবার করে সূর্যগ্রহণ না হয়ে বছরে মাত্র দু' থেকে পাঁচবার সূর্যগ্রহণ হতে পারে। তাছাড়া মহাকাশে চাঁদ, পৃথিবী বা সূর্য কোনটাই স্থির হয়ে নেই; তাই চাঁদের ছায়ার ডগা পৃথিবীর ওপর দিয়ে বিপুল বেগে ছুটে চলে যায় একটি সঙ্কীর্ণ ফালির মতো জায়গা দিয়ে। এই ফালিতে সচরাচর একশ'-দেড়শ' কিলোমিটারের বেশি হয় না। আর কোন জায়গা থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখাও যায় খুব সামান্য সময় ধরে; সচরাচর তা কয়েক সেকেণ্ড থেকে দু'চার মিনিটের বেশি হয় না। ক্বচিৎ কখনো বিষুব অঞ্চলের ওপর সাড়ে সাত মিনিট পর্যন্ত সময় ধরে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যেতে পারে। এবার ইরানের ওপর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ; বাংলাদেশের হিরণ পয়েন্টে এক মিনিটের কাছাকাছি।

যে-কোনো ছোট একটি জিনিস আমাদের চোখের সামনে ধরে সূর্যকে আড়াল করে ফেলা যায়; কিন্তু তাতে সূর্যগ্রহণের মতো ব্যাপার হবে না। তার কারণ হল সূর্যের আলো আর তাপরশ্মি পৃথিবীর ওপর আগের মতো ঠিকই পড়তে থাকবে; ছড়িয়ে যাবে

চারপাশের বায়ুমণ্ডলে। চাঁদ রয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে বহু হাজার মাইল দূরে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের দেহ যখন সূর্যকে পুরোপুরি আড়াল করে ফেলে তখন সূর্যের আলো আর তাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সেই এলাকার ওপর আদৌ এসে পড়তে পারে না। তাতে চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে; মনে হয় রাত নেমে এসেছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমে যায়; গাছপালা পশুপাখির ওপর তার প্রভাব পড়ে। উত্তর গোলার্ধে চাঁদের ছায়া ডানপাশ থেকে সূর্যকে গ্রাস করে ক্রমে ক্রমে বাঁ পাশে সরে যায়; দক্ষিণ গোলার্ধে ঘটে এর উল্টো; চাঁদের ছায়া বাঁ পাশ থেকে ঢুকে ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বিজ্ঞানীদের এত আগ্রহ কেন

সাধারণ মানুষের কাছে যেমন তেমনি বিজ্ঞানীদের কাছেও সূর্যগ্রহণ একটা বিরাট আগ্রহের বিষয়। এবার শুধু ভারতেই নানা দেশ থেকে অন্তত পাঁচশ' বিজ্ঞানী এসেছিলেন সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করতে আর সে সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে। সে হিসেবে বাংলাদেশে খুব ছোটখাট আকারের একটা আয়োজন হয়েছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পক্ষ থেকে এবং বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ, অনুসন্ধিৎসু চক্র ও বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এই তিনটি বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে; তাঁরা প্রায় দু'শ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানোৎসাহী অভিযাত্রী নিয়ে সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টে গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাঁরা সেই অভিযানে গিয়েছিলেন তাঁরা অভিভূত হয়েছিলেন এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতায়।

সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগ্রহের একটা বড় কারণ হল সৌরজগতের মূল কেন্দ্র আর শক্তির আধার যে সূর্য তার সঙ্গে একেবারে নাড়ির সম্বন্ধ আমাদের এই পৃথিবীর ভালমন্দের। অথচ প্রায় পনের কোটি কিলোমিটার দূরে এই পৃথিবী থেকে প্রচণ্ড আলোর ধাঁধায় ঢাকা সূর্যের খবরাখবর যোগাড় করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সূর্যের চারপাশের অনেক খবরই এতদিন সংগ্রহ করা গেছে কেবল যে সময় গ্রহণ লেগে সূর্যের গা চাঁদের আড়ালে ঢেকে যায় সেই সময়ে। কিন্তু সূর্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও অজানা। যেমন আমরা জানি যে, সূর্যের ভেতরকার তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর তার গায়ের ওপরকার তাপমাত্রা প্রায় ছ'হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল সূর্যের গা থেকে আরো উঁচুতে তার যে কিরীটমণ্ডল সেখানকার তাপমাত্রা কোন দুর্বোধ্য কারণে অনেক বেশি— দশ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে।

সূর্যের গায়ের ওপর দেখা দেয় এক ধরনের কলঙ্কের মতো দাগ ; এই দাগের সংখ্যা মোটামুটি এগার বছর পরপর বেড়ে ওঠে। এর সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নানা ঘটনার যোগাযোগ। এসব জানবার জন্যও সূর্য সম্বন্ধে ক্রমাগত নানা খবরাখবর সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাছাড়া সূর্য তো শুধু সৌরজগতের কেন্দ্র নয়, সূর্য হল আমাদের নিকটতম নক্ষত্র, আর এমনি নক্ষত্র এই মহাবিশ্বে আছে কোটি কোটি। নক্ষত্রলোকের আর এই মহাবিশ্বের অনেক রহস্যই ভেদ করা যেতে পারে সূর্য



সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবীর অবস্থান।

এবারের গ্রহণের সময় হিরণ পয়েন্টে মহাজাগতিক হীরক অঙ্গুরি। আলোকচিত্র : ডঃ নওয়াজেশ আহমদ হিরণ পয়েন্ট।

সম্বন্ধে খবরাখবর জেনে।

১৯১৯ সালের ২৯ মে তারিখে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় বিজ্ঞানীরা একটি ঐতিহাসিক পরীক্ষা করেছিলেন— তা থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে, ভারি মহাকাশবস্তুর পাশ দিয়ে যাবার সময় আলোকরশ্মির পথ বেঁকে যেতে পারে। এতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের একটি সিদ্ধান্তের প্রথম চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। অবশ্য আজকাল বিজ্ঞানীদের সূর্যগ্রহণের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যোগ হয়েছে মহাকাশ থেকে নেয়া নানা পর্যবেক্ষণ। তার ফলে মহাকাশের অনেক রহস্যের জটই আজ ক্রমে ক্রমে খুলতে আরম্ভ করেছে।

এবারের সূর্যগ্রহণের সময় বিজ্ঞানীরা জানতে চেষ্টা করেছেন সূর্যের সঠিক ব্যাসের মাপ; একদল ভারতীয় বিজ্ঞানী মাপতে চেষ্টা করেছেন চাঁদের ছায়ার পথটিকে; আরেক দল চেষ্টা করেছেন সূর্যের কিরীট আর তার চারপাশের গ্যাসপুঞ্জ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে। কিছু বিজ্ঞানী বেতার তরঙ্গের তারতম্য থেকে গ্রহণের সময় বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্বের পরিমাপ নিয়েছেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর প্রাণিবিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন গ্রহণের সময় উদ্ভিদ আর প্রাণীদেহে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় তার হদিস করতে। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা যাঁরা হিরণ পয়েন্টে সূর্য গ্রহণ দেখার অভিযানে গিয়েছিলেন তাঁরাও উদ্ভিদ, পশুপাখি, সূর্যের বিকিরণ ইত্যাদি নিয়ে এধরনের কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন।

সূর্যগ্রহণের মতো একটি বিশাল ব্যাপারের পর্যবেক্ষণের সার্থকতা হয় যখন নানা দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একযোগে তাঁদের কাজ সম্পন্ন করেন। নানা জায়গা থেকে নেওয়া পর্যবেক্ষণের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই এসব বিষয়ে নিখুঁত তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়। এবারে বাংলাদেশের সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের উদ্যোগে তেমনটি ঘটেছে বলে মনে হয় না। ভবিষ্যতে এ ধরনের গবেষণায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলের আরো ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ঘটবে এই আশাই আমরা করব।

একুশ শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতি

আধুনিক সমাজ যেমন জটিল হয়ে উঠেছে তেমনি জটিল হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা। আজ রাষ্ট্র যে শুধু আমাদের খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য এমনি সব মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব নেয় তা নয়, এসবের আনুষঙ্গিক এবং আগামী দিনের সমাজ নির্মাণের পথ সুগম করার জন্য আরো অনেক কিছুর দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা লেখা থাকে তার সংবিধানে। দেশের জনগণের সামগ্রিক আদর্শ ও লক্ষ্য এবং সে সব লক্ষ্য অর্জনের পন্থা সম্পর্কে রূপরেখাও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এ সকল মূল আদর্শ অনুসরণ করে প্রণীত হয় জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রের জন্য পৃথক নীতিমালা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি কথাটা সে হিসেবে খুবই নতুন বলা যেতে পারে : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এ সম্বন্ধে তেমন একটা আলোচনা কোথাও হতো না ; কেবল বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির কথা শোনা যাচ্ছে। আসলে মধ্য যুগ থেকে শিল্পবিপ্লব পেরিয়ে উনিশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা প্রধানত ব্যক্তি উদ্যোগেই ঘটেছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার জন্য বিজ্ঞানের ব্যাপক গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ মূলত বিশ শতকে দেখা দিয়েছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস দীর্ঘকালের হলেও তার সঙ্গে প্রযুক্তির প্রথম মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে অষ্টাদশ শতকের শেষে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সময়ে। এর ফলে একদিকে যেমন বিজ্ঞানের প্রসার দ্রুততর হয়, তেমনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়তে শুরু করে। অবশেষে বিশ শতকে এসে দেখা দেয় সারা পৃথিবী জুড়ে এক বিপুল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রসার যেমন দুনিয়ার বহু দেশে সাধারণ মানুষের জীবনে এনেছে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি, তেমনি সৃষ্টি করেছে নানা জটিল সমস্যাও। জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আসার ফলে ঘটেছে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি : তারই ফলে পৃথিবীর বস্তুসম্পদের সীমাবদ্ধতা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। নির্বিচার বস্তুসম্পদ ভোগের নানা ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে পৃথিবীর পরিবেশে। দেশে দেশে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে। মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা সমগ্র মানবসভ্যতার ধ্বংসের আশঙ্কা তুলে ধরেছে।

ব্যক্তি-উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় আয়োজন

এককালে বিজ্ঞানী বলতে বোঝাত প্রধানত এমন এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীকে যিনি সত্যের সন্ধানে আপন মনে গবেষণাগারে কাজ করে চলেছেন। নিউটন বলেছিলেন, তিনি একজন সাধারণ অনুসন্ধানী মাত্র তবে তিনি যে অন্যদের চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন তার কারণ তিনি দাঁড়াতে পেরেছিলেন তাঁর আগের অনেক দীর্ঘদেহীর কাঁধের ওপরে। বিজ্ঞানীদের কাজেরও যে পরিকল্পনা করা যায় এ ধারণা বিশ শতকের আগে তেমন দানা বাঁধে নি।

দেশের জনগণের জীবনমানের পরিবর্তন ঘটাবার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিপুল সম্ভাবনা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় তার অবদান বিশ শতকের শুরুতে স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর থেকেই বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দেয়া আরম্ভ হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতির অনুসারী সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশও পিছিয়ে থাকে নি। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রবল ব্যক্তি-উদ্যোগের প্রবক্তা দেশও বিজ্ঞানের গবেষণায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার কথা বলতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় ব্যাপক গুরুত্ব দিতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার বিপুল প্রতিদানও তারা পায়।

আজ সারা পৃথিবীতে দেশের অগ্রগতির একটি সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশে মোট উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের এবং বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে গবেষণাকর্মীর সংখ্যা। পৃথিবীতে আজ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের মোট সংখ্যা মোটামুটি ছ' কোটি, অর্থাৎ গড় হিসেবে সারা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ। অবশ্য বিভিন্ন দেশে এই হারে যথেষ্ট তারতম্য আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানে এই হার মোটামুটি শতকরা ৪ জন, পশ্চিম জার্মানিতে ২ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ জন। বাংলাদেশে সংখ্যা প্রতি হাজারে একজনও নয়। সাধারণত একটি দেশে মোট বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের মধ্যে শতকরা দশ থেকে পনেরজন গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকেন (বাংলাদেশে এই হার শতকরা মাত্র সাতজন), বাকিরা শিক্ষকতা ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক বা সেবামূলক পেশায় নিয়োজিত হন; তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণাকর্মীর হার অপেক্ষাকৃত বেশি— শতকরা প্রায় ২৫ জন।

কোন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আর একটি সূচক আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়নে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ। বিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীর কোন দেশেই মোট দেশজ উৎপাদনের হাজার ভাগের এক ভাগও এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ হতো না। অথচ আজ শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের দু'থেকে চার ভাগ (অর্থাৎ শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয় সাধারণত তার অর্ধেক) ব্যয় করছে এই খাতে। অনেক উন্নয়নশীল দেশেও মোট দেশজ উৎপাদনের এক শতাংশের কাছাকাছি এই খাতে ব্যয় হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বরাদ্দ বেড়েছে একশ' গুণ— ৩৪ কোটি ডলার থেকে ৩,৪০০ কোটি ডলার; ভারতে স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছরে এই খাতে বরাদ্দ

বেড়েছে প্রায় পাঁচশ' গুণ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গবেষণা ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিবেচনাকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ প্রণয়ন করতে শুরু করে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, গঠিত হতে থাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে উচ্চ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ। এ সবই আসে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের অপরিহার্যতার স্বীকৃতি হিসেবে।

উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

ষাটের দশকের শেষ দিকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে জাতিসংঘের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সত্তরের দশকে যাতে সারা পৃথিবীতে ব্যাপক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটে সে উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুপারিশ প্রণয়ন করেন; দুর্ভাগ্যক্রমে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের তেমন উদ্যোগ দেখা যায় নি।

এরপর ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে 'উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অগ্রগতির সমস্যা পর্যালোচনা করা হয়। দেখা যায় পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশের বাস হলেও এই দেশগুলিতে রয়েছে পৃথিবীর মোট গবেষক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ৯৫ শতাংশ; উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে গবেষণায় মোট অর্থসম্পদ বরাদ্দের তারতম্যও মোটামুটি একই ধরনের। আর এই অবস্থা দু'ধরনের দেশের মধ্যেকার জীবনমানের ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে। বলা হয় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অভিসারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার পরিকল্পনা অর্থাৎ তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ, অর্থ বরাদ্দ, পরিচালনা, সমন্বয়, উৎসাহ দান ও বাস্তবায়ন প্রধানত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সম্মেলনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তাই সকল উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার সহায়ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের আবেদন জানানো হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশেও একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগের সঙ্গে সে সময়ে নানা কারণে ব্যাপক বিজ্ঞানী সমাজকে জড়িত করা সম্ভব হয় নি। এছাড়া এই নীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের পাঁচ শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বিনিয়োগ প্রভৃতি কিছু অতি উচ্চাভিলাষী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এটি বিভিন্ন মহলের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে যে প্রথম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ গঠিত

হয়েছিল তা ১৯৮৩ সালে চতুর্থবারের মতো পুনর্গঠিত হবার পর আবার একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই কমিটির পক্ষ থেকে ১৯৮৫ সালের শুরুতে একটি খসড়া জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রচার করা হয় এবং এর ওপর বিজ্ঞানীসমাজ ও অন্যান্য মহলকে মতামত দিতে আহ্বান জানানো হয়। প্রায় এক বছর ধরে বহু সম্মেলন ও আলোচনার মাধ্যমে এই খসড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এর চূড়ান্ত রূপ তৈরি হয়। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারিভাবে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ঘোষিত হয়। এই নীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে দেশে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ষাটটি গবেষণা ও উন্নয়নমূলক সংস্থা রয়েছে, তাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন অন্তত সাত হাজার উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ; তাঁদের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে রয়েছেন আরো প্রায় বার হাজার বিজ্ঞানকর্মী। বলা যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাপকাঠিতে আমরা পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে একেবারে শেষের দিকে হলেও বৈজ্ঞানিক জনশক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা নিতান্ত কম নয়। এই জনশক্তিকে যদি উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগানো যায় তাহলে এদেশের বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

এদিক থেকে বলতে গেলে অবিভক্ত ভারতে উনিশ শতকে আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠতে থাকে বাংলাদেশ তারও উত্তরাধিকারী। ভারতে ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ স্থাপিত হয় ১৮৫১ সালে, উদ্ভিদতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ ১৮৯০ সালে এবং জীবতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ ১৯১৬ সালে। বৈজ্ঞানিক জরিপ ও গবেষণার অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার এই ধারা মধ্য বিশ শতকে আরো ত্বরান্বিত হয়। পাকিস্তানে কৃষি গবেষণা পরিষদ ১৯৫১ সালে, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ১৯৫৩ সালে, চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ ১৯৫৩ সালে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ ১৯৬০ সালে এবং পরমাণু-শক্তি কমিশন ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে দেশে যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির তেমন অভাব নেই, কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনার সমস্যা, অর্থাভাব এবং দেশের উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গবেষণা কর্মসূচির ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সমন্বয়ের অভাবে এই জনশক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্বটি পালনে সহায়ক হতে পারে।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতির কিছু সমস্যা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রসঙ্গে কিছু কিছু সমস্যা আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এগুলি শুধু একটি আনুষ্ঠানিক নীতি প্রণয়নের সমস্যা নয়, দেশের

সামগ্রিক অগ্রগতির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলপ্রসূ প্রয়োগ এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ ধরনের কয়েকটি সমস্যার বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিজ্ঞান নীতি ও প্রযুক্তি নীতি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অতীতে অনেকটা সমান্তরাল পথে এগোলেও আজ তাদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বস্তুজগতের যেসব নিয়মাবলি আবিষ্কার করেছে তার যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া প্রযুক্তি আজ অন্ধ, আবার প্রযুক্তির কৃৎকৌশলের সহায়তা না পেলে বিজ্ঞানের গবেষণার সুযোগ হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় সীমিত। কেউ কেউ মনে করেন প্রযুক্তির এই ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিজ্ঞান নীতির পাশাপাশি একটি জাতীয় প্রযুক্তি নীতিও প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। আবার অনেকের মতে বাংলাদেশের বর্তমান বিকাশের স্তরে পৃথক দু'টি নীতি প্রণয়ন না করে একটি সমন্বিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নই অধিকতর সঙ্গত।

বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ : আমরা সবাই জানি যে, আন্তর্জাতিক মানে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় গড়পড়তা যে হারে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তার তুলনায় বাংলাদেশে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ অতি নগণ্য। এমন কি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাতে এ খাতে যে হারে অর্থ ব্যয় হয়, বাংলাদেশ সে তুলনায়ও অনেক পিছিয়ে আছে। সেজন্য বাংলাদেশের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে উন্নয়নশীল দেশের মান অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তত এক শতাংশ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বরাদ্দের অন্তত পাঁচ শতাংশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যয়ের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে যে ইতোমধ্যে কোন অগ্রগতি ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে কোন কোন মহল থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে যে ব্যয় হয়ে থাকে তার উপযোগমূল্যের প্রশ্ন তোলা হয়। দেশের সামগ্রিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন গবেষণায় অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে—একথা অস্বীকার করা যায় না। তবু বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে অধিকাংশ গবেষণাগারে শুধু গবেষণাকর্মীদের বেতন-ভাতার খাতেই মোট বরাদ্দের ৯০ শতাংশের বেশি ব্যয় হয় এবং যন্ত্রপাতি, বই বা গবেষণার অন্যান্য উপকরণের জন্য অর্থসংস্থান প্রায়ই জোটে না, এ সত্যও অনস্বীকার্য। সাধারণভাবে বিশেষজ্ঞদের মতে আরো অনেক ক্ষেত্রের মতোই বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দের একটি নিম্নতম সার্থকতার মাত্রা রয়েছে; দেশজ উৎপাদনের অন্তত এক শতাংশ গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয় না করলে সাধারণত এ ধরনের গবেষণা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তেমন কোন ছাপ ফেলতে পারে না।

সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা : বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়নের অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব কতখানি সরকারের আর কতখানি বেসরকারি খাতের এটা উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি জটিল প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন দেশে এ বরাদ্দ পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যক্তি-উদ্যোগের প্রবক্তা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতি উন্নত ধনবাদী দেশেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে মোট জাতীয় ব্যয়ের অর্ধেক বা তারও বেশি সরকারি কোষাগার থেকে এসে থাকে। উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি খাত সাধারণত অসংগঠিত, উৎপাদন নিম্নমানের প্রযুক্তিনির্ভর এবং শিল্প-উদ্যোক্তাদের পুঁজি সীমিত। তবু বেসরকারি খাতকে গবেষণা ও উন্নয়নমুখী উদ্যোগে উৎসাহী করে তোলা গেলে সেটা দেশের অর্থনীতিতে উদ্ভাবন ও উদ্যমশীলতার বিকাশে সহায়ক হবে।

ফলিত ও মৌলিক গবেষণা : বর্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাইরে প্রধানত ফলিত গবেষণার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে যেখানে অর্থসম্পদ অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ এবং দেশের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের চাহিদা প্রায় সীমাহীন, সেখানে জাতীয় অর্থনীতির আশু সমস্যাগুলির সমাধানে সহায়ক হবে এমন গবেষণাকর্মে গুরুত্ব আরোপই বাঞ্ছনীয়। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, গবেষণা থেকে নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাকে উৎপাদনের স্তরে নিয়ে যেতে প্রায়শই তার চেয়ে দশগুণ বা তারও বেশি বরাদ্দের প্রয়োজন হতে পারে। উন্নত দেশগুলিতে সচরাচর মোট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন বরাদ্দের মধ্যে মৌলিক গবেষণায় ১০-২০ শতাংশ, ফলিত গবেষণায় ২০-৪০ শতাংশ এবং পরীক্ষামূলক বা কারিগরি উন্নয়নে ৪০-৬০ শতাংশ ব্যয় হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রধানত গবেষণাকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও বিশ্বের প্রাগ্রসর বিজ্ঞানধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার স্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের মোটামুটি ১০ শতাংশ মৌলিক গবেষণায় বরাদ্দ করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ : বিজ্ঞান গবেষণার যথোপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণ একটি দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পরিবেশ নির্মাণের উপাদান হতে পারে নানা ধরনের। সৃজনশীল বিজ্ঞানকর্মীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রাত্যহিক সমস্যা থেকে মুক্ত রেখে তাদের নিবিষ্ট গবেষণায় আত্মনিয়োগের সুযোগ দেওয়া তার মধ্যে একটি। আবার বিজ্ঞান গবেষণার প্রকৃতিই এমন যে, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না রেখে বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রে গবেষণা চালানো আজকের দিনে প্রায় অসাধ্য, এজন্য বিজ্ঞানকর্মীদের যেমন থাকা চাই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পত্রপত্রিকার সহজলভ্যতা, তেমনি চাই নানা দেশের বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুযোগ এবং নিজ নিজ বিচরণের ক্ষেত্রে চিন্তার ও কাজের স্বাধীনতা।

চাই নতুন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতি

দেশে বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতির জন্য শুধু গবেষণার পরিবেশ উপযোগী হওয়াই যথেষ্ট নয়। এসব গবেষণার ফলাফল যাতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে প্রযুক্ত হয় সেজন্য চাই সমগ্র দেশে ব্যাপক আকারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী প্রবণতা ও

কর্মোদ্যম। বিজ্ঞানীরা নিজেরা তাঁদের গবেষণাকর্ম সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত রেখে দেশে বিজ্ঞানমস্কতার প্রসারে সহায়তা করতে পারেন, তেমনি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে সহায়তা দিতে পারেন শিল্প-উদ্যোক্তাগণ। এছাড়াও বিজ্ঞানমুখী পরিবেশ রচনায় অবদান রাখতে পারেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসমাজ এবং দেশের কল্যাণকামী ও দেশপ্রেমিক সকল মানুষ।

আজ যখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জগতে পরিবর্তনের হাওয়া প্রচণ্ড বেগে বইছে তখন ১৯৮৬ সালে প্রণীত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতি বাংলাদেশের একুশ শতকের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারবে এমন সম্ভাবনা খুব কম। কাজেই আগামী শতকের চাহিদাকে মনে রেখে অবিলম্বে আমাদের একটি নতুন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এই নীতি প্রণয়নে দেশের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে অগ্রণী বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদদের মিলিত উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

আর সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি একটি অবলম্বন মাত্র। এই নীতি প্রণীত বা ঘোষিত হলেই যে দেশের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। একটি সুষ্ঠু বিজ্ঞাননীতির সুচারু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন তাকে মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতির অঙ্গীভূত করা এবং সে অনুযায়ী দেশের সরকার ও বিজ্ঞানী সমাজের জনকল্যাণমুখী ও দীর্ঘমেয়াদি একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা।

বিজ্ঞানীরা যখন বাংলায় লেখেন

ভাষার বা লেখালেখির একটা বড় ব্যবহার হল মানুষের অভিজ্ঞতার বিনিময়ে, কিংবা আরো পোশাকি ভাষায় বললে— জ্ঞানের বিস্তারে। আজকের দিনে জ্ঞানের জগতে চলছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অপ্রতিহত রাজত্ব। কাজেই স্বভাবতই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিষয় নিয়ে লেখালেখি যে-কোনো ভাষার একটা বড় এলাকা অধিকার করে থাকার কথা। বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে এই লেখালেখি দরকার হয় তাঁদের আবিষ্কারের বিষয় আর সবার কাছে জানাবার জন্য ; বিশেষ করে অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিনিময় ছাড়া বিজ্ঞান আদৌ এগোতে পারে না।

আমাদের দেশে একে তো বিজ্ঞানের চর্চা পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর মতো তেমন বিকাশ লাভ করে নি; আর যেটুকুও-বা হয়েছে তাও বিজ্ঞানীরা প্রধানত বিদেশি ভাষা ইংরেজির মাধ্যমেই করেছেন। তা সত্ত্বেও এদেশে বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখি চলছে প্রায় দু'শ বছর ধরে। তার মধ্যে উনিশ শতকের চর্চা ছিল মূলত পুথিগত ; কেননা আধুনিক পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে তখন কেবল শৈশব অবস্থায়। সত্যিকার অর্থে বঙ্গীয় বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য বিগত একশ' বছরে (অর্থাৎ বিশ শতকে) একটা মোটামুটি পরিণত রূপ লাভ করেছে।

১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এবং তারপর থেকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের মূল ভূমিকা ছিল রাজ্য শাসন, রাজস্ব সংগ্রহ আর এক অসম বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। অবশ্য কোম্পানির কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি কিছুটা সম্ভ্রমবোধ জেগেছিল; তাই তাঁরা ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে উৎসাহ দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে তরুণ বিচারপতি উইলিয়াম জোন্‌স্-এর উদ্যোগে ১৭৮৪ সালে কলকাতায় "এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি" বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই সোসাইটির উদ্যোগে এদেশের উদ্ভিদ, প্রাণী, ভূতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু এই সোসাইটির ভাষামাধ্যম ছিল ইংরেজি। কাজেই এসব গবেষণাকর্মও সবই হয়েছিল ইংরেজিতে— প্রধানত ইংরেজ পণ্ডিতদের উদ্যোগে এবং তাঁদের দ্বারা। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সোসাইটিতে এদেশীয়দের অংশগ্রহণ ছিল নিতান্তই সীমিত।

খ্রিস্টীয় আঠার শতকের শেষভাগ থেকে এদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে একটা বিষয়

নিয়ে বেশ আলোড়ন চলছিল; তা হল কোন্ ধরনের শিক্ষার ধারা প্রাধান্য পাবে। কিছু ইংরেজ রাজকর্মচারী আর সেই সঙ্গে এদেশের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মনে করছিলেন প্রাচ্যধারার শিক্ষার ভিত্তিতেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার; অন্যদল বলছিলেন প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পুঁজি অতি সামান্য, কাজেই পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারাকে এদেশে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে শিক্ষা প্রসারের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। শিক্ষার ধারা সম্পর্কে এই বিতর্ক চলতে থাকায় দীর্ঘকাল ধরে সে অর্থের যথাযথ ব্যবহারের পদ্ধতি স্থির করা যায় নি।

প্রথমোক্ত ধারার অনুসারীদের উদ্যোগে কলকাতায় মাদ্রাসা (১৭৮০) এবং কাশীতে (১৭৯১) ও কলকাতায় (১৮২৪) সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এসব উদ্যোগের পেছনে যতটা না কাজ করছিল প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ তার চেয়ে বেশি ছিল শাসনকার্যের স্বার্থে প্রচলিত মুসলিম ও হিন্দু আইন প্রয়োগের জন্য আরবি-ফারসি ও সংস্কৃত ভাষা-জানা রাজকর্মচারীর প্রয়োজন। এদেশীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) প্রমুখ অগ্রণী সমাজ সংস্কারক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন।

পাশ্চাত্য ধারার উগ্র প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন লর্ড মেকলে (T. B. Macaulay)। তিনি প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি প্রচুর অবজ্ঞা প্রকাশ করে শাসনকার্যে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন (১৮৩৫) ; আর সে সুপারিশই বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কার্যকর করেছিলেন। এই ইংরেজি ধারা প্রবর্তনে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ প্রগতিপন্থী ভারতীয়দেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রামমোহন রায় বিলেতের মতো এদেশের স্কুল-কলেজে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানাচ্ছিলেন।

উনিশ শতক : ভিত্তি স্থাপন

বাঙলাভাষার চর্চায় প্রথম আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি প্রবর্তন করেছিলেন শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনারিরা। বাঙলাভাষায় প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক বই লেখার উদ্যোগও নিয়েছিলেন তাঁরাই। বলা বাহুল্য বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা ও বিজ্ঞান বিষয়ে বই রচনা পরস্পর সম্পর্কিত। ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ার প্রমুখের উদ্যোগে কলকাতায় হিন্দু কলেজ (পরবর্তীকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজেই এদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা চালু হয়। তবে এখানেও শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি।

এসময়ে কলকাতায় এবং মফস্বলে কিছু পাশ্চাত্য ধারার স্কুল গড়ে ওঠে; তাদের জন্য পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮১৭ সালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বাঙলায় স্কুলের উপযোগী শিক্ষামূলক বই প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। এই বছরই সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় রবার্ট মে-র 'অঙ্ক পুস্তকং' (মে-গণিত); এই চটি পাঠ্যপুস্তকটিই বাঙলা ভাষায় এ ধরনের প্রথম মুদ্রিত

বই। এ বইটি কবিতায় লেখা হয়েছিল। ১৮১৯ সালে সোসাইটি জন হার্লের 'গণিতাঙ্ক' নামে যে বই প্রকাশ করে তাতেও যথেষ্ট কবিতা ব্যবহৃত হয়। শ্রীরামপুর মিশন থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের উদ্যোগে 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) নামে প্রথম বাঙলা মুদ্রিত সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে নিয়মিতভাবে পদার্থবিদ্যা, ভূগোল ও ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা স্থান পেত।

বাঙলাভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেছিলেন উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী (১৭৮৬-১৮২২)। তাঁর শারীর ও অস্থিবিদ্যা বিষয়ক বই 'বিদ্যাহারাবলী' কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর পরিকল্পনা ছিল বিশ্বকোষ ধরনের ; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা এর আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সোসাইটি ১৮২৮ সালে জন লসন সঙ্কলিত ও পিয়ার্স অনূদিত 'পশ্বাবলী' প্রকাশ করে। বইটির ছ'টি খণ্ড মাসিক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

এসময়েই (১৮২৪) উইলিয়াম ইয়েট্‌স্-এর লেখা প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় 'পদার্থবিদ্যাসার' প্রকাশিত হয়। এ বইতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূবিজ্ঞান, জীব, শারীর ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছিল। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮৩৩ সালে ফারগুসন সঙ্কলিত ও ইয়েট্‌স্ অনূদিত 'জ্যোতির্বিদ্যা' নামে একটি বই বেরোয়। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বাঙলাভাষায় এটিই প্রথম বই; প্রাঞ্জল ভাষার জন্য বইটি সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

এ সময়েই শ্রীরামপুর মিশন থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ভূগোল বিষয়ক বই 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বছর কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে উইলিয়াম হপকিন্স পিয়ার্সের 'ভূগোলবৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়। এগুলো মূলত স্কুলের পাঠ্যবই হিসেবে লেখা হয় ; এসব বইতে লেখকদের ধর্মযাজকের মনোবৃত্তির প্রকাশও বেশ স্পষ্ট ছিল। বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁরা প্রায়শ ধর্মীয় ব্যাখ্যা জুড়ে দিতেন। তবে বইগুলোতে ভারতীয় আবহ সৃষ্টির চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়; যেমন সময় বোঝাতে দণ্ড, দূরত্ব বোঝাতে ক্রোশ প্রভৃতি একক এবং গণিতে শুভঙ্করের আর্যা ব্যবহৃত হয়।

বাঙলায় রসায়নবিজ্ঞানের প্রথম বই জন ম্যাক (১৭৯৭-১৮৪৫)-এর 'কিমিয়া বিদ্যার সার' ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। এ বইটি ইংরেজি ও বাঙলা দু'ভাষায় লেখা হয়– বাঁ পৃষ্ঠায় ইংরেজি ও ডান পৃষ্ঠায় বাঙলা। এছাড়া রসায়নের বিশেষ শব্দগুলোকে সামান্য পরিবর্তন করে ইংরেজি রূপেই রাখা হয়েছে; যেমন অক্সিজান (Oxygen), নৈত্রজান (Nitrogen), হৈদ্রজান (Hydrogen) ইত্যাদি। ইউরোপীয়দের লেখা এসব বইতে প্রায়শ ইংরেজি-ঘেঁষা এক ধরনের অদ্ভুত বাঙলা ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন জন ম্যাক-এর ভাষায় নমুনা : "অক্সিজান সামান্য আকাশ হইতে ভারী আছে।" এদেশীয়দের মধ্যে রামমোহন রায়ই প্রথম ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতি বিষয়ে তিনটি বই লেখেন। তবে এগুলো এখন আর পাওয়া যায় না। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৪) প্রথম বাঙালি যিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান নিয়ে বাঙলা-ভাষায় জনপ্রিয় বই লেখেন।

উনিশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা গ্রন্থাকারে এবং কোন কোন সাময়িক পত্রে রচনার আকারে প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হয়েছিল। তবে এসব আলোচনার মান তেমন উচ্চাঙ্গের ছিল না; প্রায়শ সাধারণ পাঠকদের কাছে সেগুলো ছিল দুর্বোধ্য। তবে এটা স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতি এদেশের মানুষের মনকেও নাড়া দিয়েছিল। তাই পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদ ও রচনার চাহিদা এদেশেও সৃষ্টি হচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের রচনা প্রকাশিত হয় 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২) পত্রিকায়। এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন বাঙলা গদ্য রচনার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত। সম্ভবত তিনি নিজেই এসব রচনার অধিকাংশ লিখতেন। অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) পত্রিকাতেও উঁচু মানের বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হত।

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রথম বই ভূগোল বিষয়ে, এটি ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'; এটি দু'খণ্ডে ১৮৫১ ও ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। রচনাগুলো তার আগে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় স্থান পেয়েছে। তাঁর স্কুলপাঠ্য তিনখণ্ড চারুপাঠ (১৮৫৩, ১৮৫৪ ও ১৮৫৯) বইতেও নানা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। এসব রচনায় প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার নানা বিষয়ের সমাহার ঘটেছে আর রচনাকে জনপ্রিয় করার দিকে বেশ নজর দেয়া হয়েছে। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 'পদার্থবিদ্যা' বইটি অবশ্য সুপরিকল্পিতভাবে শুধু পদার্থবিদ্যার বিষয় (প্রধানত জড় ও জড়ের গুণ) নিয়ে লেখা।

বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞান আলোচনার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙলা পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেশ কিছু নতুন নতুন শব্দ তৈরি করেন (যেমন electricity=তাড়িত, inertia=জড়ত্ব, non-conductor=অপরিচালক, thermometer = তাপমান, centre of gravity = ভারকেন্দ্র ইত্যাদি) যেগুলো পরবর্তীকালে অনেকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনা শুধু যে বাঙলায় বিজ্ঞান আলোচনার ভিত তৈরি করেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছে তাই নয়, বাঙলা গদ্য সাহিত্যেরও একটি পরিশীলিত রূপ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় অক্ষয়কুমার যে কিভাবে ভাষার সৌকর্য বিধান করেছেন তার নমুনা হিসেবে তাঁর একটি রচনায় জলস্তম্ভের বর্ণনা উদ্ধৃত করা হল :

> "জলস্তম্ভ দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলি যেন বিশ্বাধিপতির পৃথ্বিরূপ প্রাসাদের পরম রমণীয় ছাদস্বরূপ প্রতীয়মান হয় এবং জলস্তম্ভ যেন প্রকৃত স্তম্ভ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া থাকে।"

উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ছাড়া আরো যাঁরা বাঙলায়

বিজ্ঞান আলোচনায় এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) জ্যামিতি ও ভূগোল নিয়ে বই লিখেছিলেন; 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' তাঁর একটি বিখ্যাত বই। তিনি 'সংবাদ সুধাংশু' নামে যে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তাতেও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত।

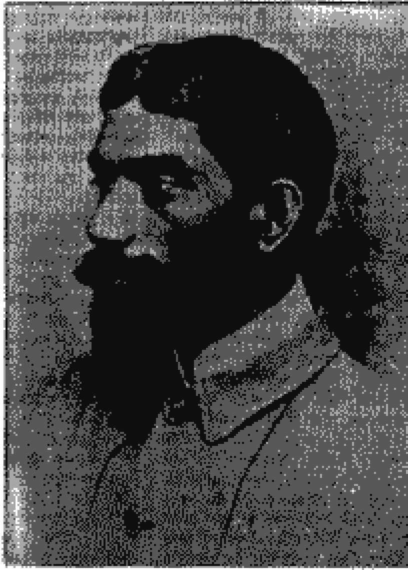
বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৭১) একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তিনি 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং এই দু'টি পত্রিকাতেই বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হত। তাঁর নিজের রচনার বিষয় ছিল প্রধানত প্রাকৃতিক ভূগোল ও প্রাণিবিজ্ঞান। পরিভাষা তৈরির বিষয়ে তিনি বেশ কিছু মৌলিক চিন্তা করেছিলেন এবং এ নিয়ে লেখালেখিও করেছিলেন। ১৮৮২ সালে পরিভাষা রচনার উদ্দেশ্যে যে 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি তার সভাপতি ছিলেন। এদের প্রকাশিত পরিভাষার খসড়াও তিনিই তৈরি করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে বাঙলায় কয়েকটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞান আলোচনার বিকাশ

উনিশ শতাব্দীর শেষদিকে আর যেসব পত্রিকা বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে রয়েছে 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯), 'আর্যদর্শন' (১২৮১), 'ভারতী' (১২৮৪) প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্র। বঙ্গদর্শনে প্রথম দিকে যেসব বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয় তার অধিকাংশেরই লেখক পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) স্বয়ং। প্রাণিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর এসব রচনায় ভাষার সাবলীলতা ও রচনার বাঁধুনিতে বাঙলায় বিজ্ঞান আলোচনা এক নতুন মাত্রা পেল। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কয়েকটি শিরোনাম হল: 'আকাশে কত তারা আছে' (অগ্রহায়ণ ১২৭৯), 'চঞ্চল জগৎ' (ভাদ্র ১২৮০), 'গগন পর্যটন' (পৌষ ১২৮০) ও 'পরিমাণ রহস্য' (চৈত্র ১২৮০ ও আষাঢ় ১২৮১)। এসব রচনা পরে তাঁর 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫) বইতে সঙ্কলিত হয়।

১২৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় বহুকাল ধরে গণিত বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়া এসময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় : যেমন 'বিজ্ঞান-কৌমুদী' (১৮৬০), 'বিজ্ঞান-রহস্য' (১২৭৮), 'বিজ্ঞান-বিকাশ' (১২৮০), 'বিজ্ঞান-দর্পণ' (১২৮৩) ও 'সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ' (১২৮৯)। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আজ থেকে একশ' বছরেরও বেশি আগে উনিশ শতকের শেষভাগে, যখন এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান গবেষণার কেবল শৈশবকাল, তখনও বাঙলাভাষায় শুধু বিজ্ঞান বিষয়ক বেশ ক'টি পত্রিকা বের করা সম্ভব হয়েছিল। স্বভাবতই সামাজিক চাহিদা না থাকলে এসব পত্রিকা চালু রাখা সম্ভব হত না।

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



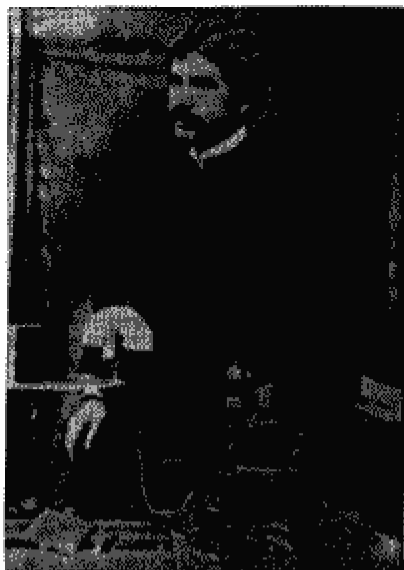
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙলায় রসায়ন ও অন্যান্য বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। প্রথম দিকে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না, শুধু এন্ট্রাস পরীক্ষার আয়োজন এবং বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসূচি নির্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণ ছিল তার দায়িত্ব। ১৮৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ. পরীক্ষার যে শিক্ষাসূচি নির্ধারণ করে তাতে রসায়ন ও প্রাকৃতিক ভূগোল ছিল অবশ্যপাঠ্য বিষয়; এছাড়া জড়বিজ্ঞানের যেকোনো দু'টি বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল। এম.এ. পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হল।

প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চার এই প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮৬৯ সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আলোচনা ও চর্চার জন্য কলকাতায় একটি 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভা' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। অবশেষে প্রধানত তাঁর উদ্যোগে ১৮৭৬ সালে পরীক্ষাগারে সজ্জিত এই ভারতীয় বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত হল। এই বিজ্ঞানসভা এদেশে বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রেখেছিল। এর আগেই শতাব্দীর মধ্যভাগে টেলিগ্রাফ লাইন (১৮৫১) ও রেলপথ (১৮৫৩) স্থাপিত হয়েছিল। তার কিছুদিন পর বৈদ্যুতিক আলোক এবং তারও পরে বেতার যোগাযোগের আবির্ভাব ঘটল। বিজ্ঞানের এসব অভাবনীয় আবিষ্কার যেমন মানুষের জীবনযাত্রায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলল, তেমনি তাদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর আগ্রহ সঞ্চারিত হল। এসময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে যেসব বই লেখা হয় সেগুলো প্রধানত স্কুলের পাঠ্যবই হিসেবেই লেখা হয়েছিল। এসব বই যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের অনেকের বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা ছিল না, কিন্তু তবু তাঁরা বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার ভিত্তি স্থাপনে মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)-এর লেখা বোধোদয়-এ প্রচুর প্রাথমিক ধরনের বিজ্ঞান প্রসঙ্গ রয়েছে।

এ সময়ে বিজ্ঞানবিষয়ক যেসব বই বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি হল নবীনচন্দ্র সেনের 'খগোল বিবরণ' (১২৭৩), যাদবচন্দ্র বসুর 'রসায়ন' (১৮৭৮), গিরিশচন্দ্র বসুর 'ভূতত্ত্ব- প্রথম ভাগ' (১২৮৮) এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' (১২৮৯)।

বিশ শতক: আধুনিকতার ধারা



জগদীশচন্দ্র বসু

উনিশ শতকে ইউরোপীয়রা বাঙলা ভাষায় পাশ্চাত্য ধরনের বিজ্ঞান আলোচনার সূচনা করেছিলেন আর তার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে এধরনের বিজ্ঞান আলোচনায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগল বিশ শতকের গোড়ায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায় প্রমুখের রচনায়।

রামেন্দ্রসুন্দর (১৮৬৪-১৯১৯) পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন বিজ্ঞানের নানা বিচিত্র জটিল বিষয়কে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার কাজে। তাঁর একটি প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাভাষার সমৃদ্ধি সাধনও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। বলা যায়, বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যচর্চার মেলবন্ধনের তিনিই সূচনা করেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের অতি সুপরিচিত বইগুলোর মধ্যে প্রধান হল 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) ও 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০)। এসব বইতে পরিবেশচিন্তা, বিজ্ঞানচিন্তা ও দর্শনচিন্তার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিপ্লবের রোমাঞ্চ তিনি তাঁর লালিত্যময় ভাষায় বাঙলাসাহিত্যে সঞ্চারিত করেছেন। বিজ্ঞানের জটিল ধারণাকে পরিভাষাবর্জিত ভাষায় তিনি কিভাবে সহজ করে তুলেছেন তার নমুনা :

> "এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করিতে পারি— যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি— তবে সেই জলের ফোঁটায় এক একটি অণু এক একটি বলের মত বড় দেখাইবে।" (প্রকৃতি: পরমাণু)

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে অনেক চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর নাম হল 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (১৩০১: ২), 'রাসায়নিক পরিভাষা' (১৩০২: ২), 'বৈদ্যক পরিভাষা' (১৩০১) ও 'ভৌগোলিক পরিভাষা' (১৩০৬: ৪) এবং 'শরীরবিজ্ঞান


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পরিভাষা' (১৩১৭: ৪)। এর অধিকাংশ রচনাই তাঁর 'শব্দকথা' (১৯১৭) বইতে সঙ্কলিত হয়েছে। তিনি ইংরেজি ভাষা থেকে বৈজ্ঞানিক শব্দ বাঙলায় গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সব শব্দকে হুবহু গ্রহণ করা বাঙালির স্বভাবের উপযোগী মনে করেন নি। তাঁর মত হল :

"বাক্যের সহিত অর্থের হরগৌরী-সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিজাতীয় অনাত্মীয় বাক্য আমাদের সাধারণের নিকট স্বতঃ অর্থহীন; সবিশেষ অভ্যাস সহকারে ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে মনে টানিয়া আনিতে হয়; অর্থ আপনা হইতেই মনে আসে না। সুতরাং কেবলমাত্র ইংরেজী শব্দগুলি বাঙ্গালা হরপে বসাইয়া পরিভাষা প্রণয়ন করিলে ইহাতে ফলোদয় হইবে না।" (রাসায়নিক পরিভাষা) বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে একই জিনিস বোঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয় সে সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষ সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মত হল :

"প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র।" (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)

পরিভাষার ব্যাপারে তাঁর মন অনেকটা সংস্কারমুক্ত ছিল। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন: "জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতনভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়; নূতন শব্দের প্রণয়ন করিতে হয়।" সেকালে অনেকে অম্লজান, যবক্ষারজান, উদ্‌জান এসব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করলেও রামেন্দ্রসুন্দর সাধারণ্যে প্রচলিত ইংরেজি শব্দ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন এসব শব্দই ব্যবহার করেছেন।

বিশ শতকের প্রথম দশকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণাকর্মের সূচনা হয় এবং দ্বিতীয় দশকে কলকাতা সমগ্র ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬) প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এসব রচনার কোন কোনটিতে সমকালীন বিজ্ঞানের গভীর ও জটিল বিষয়ও স্থান পেতে থাকে। যেমন 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত মেঘনাদ সাহার 'আইনস্টাইন ও বর' (পৌষ ১৩২৯) এবং 'আসটান' (ফাল্গুন ১৩২৯)

প্রবন্ধ দু'টির কথা উল্লেখ করা যায়।

সেকালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' (১২৯৭) পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের গবেষণামূলক ও জনপ্রিয় উভয় ধরনের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। 'সাধনা' (১২৯৮) পত্রিকাতেও বিজ্ঞান বিশেষত জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হত। এসব রচনার লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেক কবি-সাহিত্যিকও ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত শিশু-কিশোরদের উপযোগী পত্রিকা 'মুকুল' (১৩০২)-এও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা নিয়মিত স্থান পেত। পরবর্তীকালে প্রকাশিত ছোটদের পত্রিকা 'শিশু' (১৩১৯), 'সন্দেশ' (১৩২০), 'শিশুসাথী' (১৩২৯) ও 'রামধনু' (১৩৩৪) প্রভৃতিতেও প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।



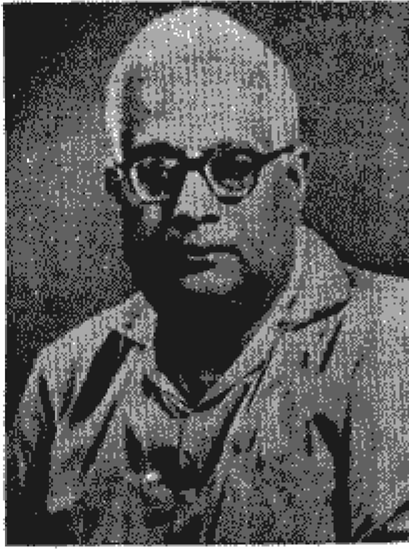
মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা

অপেক্ষাকৃত গবেষণামূলক রচনাসমৃদ্ধ পত্রিকা ছিল সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি' (দ্বিমাসিক, ১৩৩১)। এছাড়া সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকাতেও এ ধরনের রচনা প্রকাশিত হত। লেখকদের মধ্যে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, সহায়রাম বসু, মেঘনাদ সাহা, স্নেহময় দত্ত প্রমুখ।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ বাড়বার ফলে বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় ব্যাপক তৎপরতা দেখা গেল। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হল প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত 'নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি'। এছাড়া রসায়নের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বহু রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল। ১৯২৪-২৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত হল জগদানন্দ রায়ের পদার্থবিদ্যাবিষয়ক বেশ ক'টি বই 'শব্দ', 'আলো', 'তাপ', 'চুম্বক', 'স্থিরবিদ্যুৎ' ও 'চলবিদ্যুৎ'। তাঁর 'গ্রহ-নক্ষত্র', 'নক্ষত্র চেনা', 'গাছপালা' (১৯২১), 'পোকামাকড়' (১৩২৬), 'মাছ ব্যাঙ সাপ' (১৯২৩), 'বাঙলার পাখী' (১৯২৪), 'পাখী' (১৩৩১) ছোটদের উপযোগী আকর্ষণীয় বই। এছাড়া সর্বসাধারণের জন্য সুখপাঠ্য কিছু বিজ্ঞানগ্রন্থ হল 'প্রকৃতি পরিচয়' (১৩২১), 'প্রাকৃতিকী' (১৯১৩) ও 'বৈজ্ঞানিকী' (১৩২০)।

বিজ্ঞানীদের বাঙলা ভাষা চর্চা

বিশ শতকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এ সময়ে প্রকৃত বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা বাঙলাভাষায় তাঁদের নিজস্ব গবেষণার বিষয় প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন।



সত্যেন্দ্রনাথ বসু

এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। অবশ্য এ সময়েও বিজ্ঞান গবেষণায় নিযুক্ত নন এমন সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবীরাও সার্থক বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) বইটি ভাষার সৌকর্য ও প্রভাবের গভীরতায় অনন্য বিশিষ্টতায় মণ্ডিত।

জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' (১৩২৮) বইটি কতকগুলো প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সঙ্কলন। রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে বিষয়বস্তু ও ভাবের দিক থেকে একটি ঐক্য রয়েছে। আমাদের নিত্যকার পরিচিত জগতে যে নানা অব্যক্ত রহস্যের লীলা বয়ে চলেছে তার কথাই তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই অব্যক্ত জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁর গভীর প্রত্যয় 'অদৃশ্য আলোক' শীর্ষক প্রবন্ধে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

> "আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে প্রদত্ত 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' (১৯১১) শীর্ষক অভিভাষণে কবি ও বিজ্ঞানীর বিশ্বদৃষ্টির তুলনা করে তিনি বলেছেন:

> "কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার স্বভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য, প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র দু'জনই যথাক্রমে ফরিদপুর ও খুলনার গ্রাম্য বিদ্যালয়ে

শিক্ষাজীবন আরম্ভ করেন। আর পাশ্চাত্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও দু'জনের মধ্যেই বিজ্ঞানকর্মে ও সাহিত্যচর্চায় এক গভীর স্বাদেশিকতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ 'নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' বাঙলা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'রাসায়নিক পরিভাষা' (১৩১৯) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "বাঙালী মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রচার না করিলে কখনই ভাষার ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইবে না।"



কাজী মোতাহার হোসেন

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই দৃঢ় প্রত্যয় অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা (১৯০০-৭৭) প্রমুখ সমকালীন অন্যান্য বিজ্ঞানীর রচনাতেও দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আরো ক'জন সহকর্মীর উদ্যোগে ১৯৪১ সালে 'বিজ্ঞান-পরিচয়' নামে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি কলকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন ও মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনসমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা, জনকল্যাণে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি বিখ্যাত উক্তি হল, "যাঁরা বলেন বাংলায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।" অনুরূপ মনোভাব থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগেই মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা লেখেন,

> "বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সংখ্যা গণনায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষীর তুলনায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে, সুতরাং বিশ্বসাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙলার যে আসন, ভারত, বাঙলা, পাকিস্তানের অন্য কোন ভাষাই সেখানে পৌঁছায় না। এমন যে ভাষা তাকে জগতের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরোভাগে দাঁড়াতে হবে। বর্তমানের বৈজ্ঞানিক জগতে বিজ্ঞানের পরিভাষা দিয়ে তার সমৃদ্ধি তাই অত্যন্ত আবশ্যক। আমাদের সাহিত্য কোন ক্ষুদ্র দেশের অবহেলিত সাহিত্যের সঙ্গে স্থান নিতে পারে না। তাকে তার যোগ্য স্থান বিশ্বের দরবারে অধিকার করতে হবে। বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারায় এই ভাষার পরিপুষ্টি তাই একান্তভাবে দরকার।"

কুদরাত-এ-খুদার 'যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প' ১৩৫০ সালে বিশ্বভারতী

থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভাগোত্তরকালে তাঁর 'পরমাণু-পরিচিতি' (১৯৫৭), 'বিচিত্র বিজ্ঞান' (১৩৭১), 'পূর্ব পাকিস্তানেরা শিল্পসম্ভাবনা' (১৩৭১), 'জৈব রসায়ন' (চার খণ্ড, ১৯৬৬-৭১) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে এম আকবর আলী (বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৯ খণ্ড), মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (খগোল পরিচয়, তারা পরিচিতি, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা, বিশ্ব ও সৌরজগত প্রভৃতি), শাহ ফজলুর রহমান (গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, মহাশূন্যে অভিযান), আবদুল হক খন্দকার (জীবজগতের জন্মকথা, বিচিত্র যত পদার্থ, ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী প্রভৃতি), জহুরুল হক (জীবন ও বিজ্ঞান, তড়িৎ-কৌশল পরিচয়, বিজ্ঞান নিয়ত সঙ্গী, মানুষের শক্তি প্রভৃতি) প্রমুখ বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। একইভাবে 'বাঙলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা' এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সাময়িকীও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেয়া

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বাঙলাভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার ঐতিহ্য প্রায় দু'শ বছরের; অর্থাৎ বাঙলা গদ্য সাহিত্যের সূচনাকাল থেকেই। প্রথম দিকে এসব আলোচনার উপজীব্য ছিল মূলত স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানের বই এবং কিছুটা দৈনন্দিন বিজ্ঞান বিষয়ে জনশিক্ষামূলক বই। উনিশ শতকের শেষে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হবার ফলে বাঙলাভাষায় বিজ্ঞানের উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বিজ্ঞানের গবেষণাকর্ম ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে এবং গবেষণারত বিজ্ঞানীরা বাঙলাভাষার মাধ্যমে তাঁদের চর্চার বিষয়ে লিখতে আরম্ভ করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে এসব রচনা মূলত তিন ধরনের : পাঠ্যপুস্তক, জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনা এবং গবেষণামূলক বিজ্ঞান রচনা। প্রথম ও দ্বিতীয় দু'ধরনের রচনার ঐতিহ্যই দীর্ঘকালের। এসব রচনা প্রথম দিকে প্রায়শ প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানশিক্ষাহীন সাহিত্যসেবীরা লিখলেও, পরবর্তীকালে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বিজ্ঞানীরা এধরনের রচনায় বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসতে থাকেন। তবে গবেষণামূলক বিজ্ঞান রচনার ধারা বাঙলা ভাষায় এখনও বেশ দুর্বল।

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে উচ্চশিক্ষাসহ জীবনের সর্বস্তরে বাঙলা প্রচলনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এযাবৎ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ে যেসব বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে তা পরিমাণ বা গুণগত মানে মোটেই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে উপযুক্ত লেখকের, উপযুক্ত ভাষার, অর্থসংস্থান, ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের। এই সমস্যা যেমন বিজ্ঞানীদের, তেমনি ভাষাবিদদের এবং এদেশের কল্যাণকামী সকল নাগরিকের। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার যে ঐতিহ্য তাকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

বিজ্ঞান নিয়ে লেখা তেমন কঠিন নয়

বিজ্ঞান কী আর বিজ্ঞান নিয়ে লেখারই-বা দরকার কি সেটা বোধহয় আজ আর ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশে এককালে কিশোর-কিশোরী মাত্রই উঠতি বয়সে কিছু না কিছু কবিতা লিখত। সেই কবিতার চর্চা নিশ্চয়ই এখনও ফুরিয়ে যায় নি; কিন্তু সেই সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু না কিছু লেখা— অন্তত স্কুলের রচনা লেখার জন্য হলেও— আজ প্রায় সব ছেলেমেয়েকেই করতে হচ্ছে। বড়দের মধ্যেও অনেকে, হয়তো পেশার তাগিদে, কখনো-বা শখের বশে বিজ্ঞান, কৃষি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এসব নিয়ে লিখছেন।

কারো কারো ধারণা বিজ্ঞান একটা খুব কাঠখোট্টা রকম কঠিন জিনিস; তা নিয়ে লেখাও প্রায় সে রকমই। আসলে বিজ্ঞান হল প্রকৃতির নিয়মকানুন জানার পদ্ধতি; এই পদ্ধতি সম্বন্ধে মাদাম কুরী একদিন বলেছিলেন, বিজ্ঞান হল পরম সুন্দর। আর লেখার সঙ্গে যে শিল্পের একটা সম্বন্ধ আছে সে আর কে না জানে? তাই বিজ্ঞান নিয়ে যিনি লিখবেন তাঁকে যদি পাঠকরা একই সঙ্গে বিজ্ঞানী আর শিল্পী হিসেবে দেখতে চান তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু এটুকু বলা যায় যে, আসলে বিজ্ঞান নিয়ে লেখা মোটেই কঠিন নয়— যদি আপনার জানা থাকে আপনি কেন লিখছেন, কার জন্য লিখছেন, আর কী ধাঁচের লেখা আপনি লিখতে চান।

ইতিহাসে দেখা যায়, কখনো কখনো খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা মানুষ প্রথম জেনেছে খুব সাদামাটা সংক্ষিপ্ত লেখার মাধ্যমে। এ রকম লেখার নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়: আইনস্টাইনের বস্তু ও শক্তির অভিন্নতার সূত্র (১৯০৫), সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন (১৯২৪) বা ডি.এন.এ.-র গড়ন সম্পর্কে ওয়াটসন ও ক্রিক-এর যুগান্তকারী নিবন্ধ (১৯৫৩)। এসব নিবন্ধ লেখা হয়েছিল মূলত বিদগ্ধ বিজ্ঞানী সমাজের এক ক্ষুদ্র বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে। সাধারণ পাঠক সমাজের জন্য সুখপাঠ্য ভাষায় লেখার কোন দায় সে লেখকদের ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক লেখালেখির বেলায় এই বিশেষ দায়ের প্রশ্নটি দেখা দেয়; ফলে সে সব লেখার ভাষা আর রচনাশৈলী রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কার জন্য আর কেন লেখা

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান নিয়ে লেখার বেলায় সেটা কি উদ্দেশ্যে আর কার জন্য লেখা হচ্ছে এসব প্রশ্ন রীতিমতো জরুরি— কেননা মূলত তার ওপরই নির্ভর করবে লেখার ধরন বা শৈলী।



মাদাম কুরী (১৮৬৭-১৯৩৪) : "আমার চোখে বিজ্ঞান হল অনিন্দ্যসুন্দর; গবেষণাগারে পরীক্ষারত বিজ্ঞানী একজন কুশলী শুধু নন, কল্পকাহিনীকে হার মানানো প্রকৃতির অনন্ত রহস্যমালায় বিমুগ্ধ তিনি এক শিশু।"

কেন লেখা হচ্ছে— প্রথমে এ প্রশ্নটা বিবেচনা করা যাক। গোড়াতেই বলে নেওয়া দরকার যে, লেখালেখির ব্যাপারটা আসলে বিজ্ঞানচর্চার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির যেসব রহস্য উদ্ঘাটন করেন তা তাঁরা অন্য বিজ্ঞানীদেরকে জানাতে চান; এটা বিজ্ঞানীর পেশারই একটা শর্ত। বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমাগত অভিজ্ঞতা আর ভাবের আদান-প্রদান না ঘটলে বিজ্ঞান মোটেই এগোতে পারে না।

আজকের দিনে মানুষ প্রকৃতির এমন সব জটিল রহস্য উদ্ঘাটনের সাধনায় মগ্ন যে, তাতে বহু ক্ষেত্রের অসংখ্য বিজ্ঞানীর সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ছাড়া সাফল্য লাভ করা দুঃসাধ্য। এই সমষ্টিগত উদ্যোগের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিনিময় ছাড়া উপায় নেই। এজন্যই বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকাশনাকে এমন গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই অভিজ্ঞতা ও ভাবের বিনিময় যেমন প্রয়োজন বিশেষ গবেষণাক্ষেত্রের ছোট বিশেষজ্ঞ গণ্ডির মধ্যে, তেমনি প্রয়োজন নানা ক্ষেত্রের বৃহত্তর বিজ্ঞানী সমাজের মধ্যে— যাঁদের কাজের সঙ্গে ঐ গবেষণার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক থাকতে পারে।

সেই সঙ্গে বিজ্ঞান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্তাও নয়। সমাজ একদিকে বিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হয়, তেমনি আবার অন্যদিকে বিজ্ঞানকে সহযোগিতা ও সমর্থন যোগায়। বিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষকে তাঁদের আবিষ্কারের কথা জানালেই কেবল মানুষ তা কাজে লাগাতে পারে। আবার সমাজের সমর্থন ছাড়া শুধু যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি দুঃসাধ্য হয় তা নয়, তার অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। তাই বিজ্ঞানীরা কি করছেন আর তা কিভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে সে বিষয়ে গবেষণাগারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে সাধারণ মানুষকেও সব সময়ই অবহিত রাখার প্রয়োজন আছে।

এভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে স্বার্থ যে শুধু সাধারণ মানুষের তা নয়; বিজ্ঞানীদের স্বার্থও যথেষ্ট। আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা রীতিমতো ব্যয়বহুল; আর সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান ব্যাপক জনসমাজের সমর্থন ছাড়া ঘটা সম্ভব নয়। আর গণতান্ত্রিক সমাজে দেশের সম্পদ কিভাবে ব্যয় হচ্ছে সে সিদ্ধান্তের বেলায়

সাধারণ মানুষের মতামতের অবশ্যই মূল্য রয়েছে। লোকে বিজ্ঞানীদের সমর্থন দেয় বলেই তাঁরা তাঁদের গবেষণা কাজ চালাতে পারেন। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা আর আবিষ্কারের কথা সাধারণ মানুষকে জানিয়ে প্রায়শই প্রচুর আনন্দও পেয়ে থাকেন। এমনি আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে কখনো কখনো তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নির্দেশনাও পান। বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার যদি মানুষের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে তাহলে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের জানাবার অধিকার মানুষের আছে। সে সব মতামত জেনে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার ধারা বদলাতে পারেন।

সমাজের আর দশজন মানুষের কল্যাণ সাধনের মহৎ সদিচ্ছার কথা বাদ দেওয়া যাক। শেষ বিচারে এই সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞানীদের কল্যাণও অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। বিজ্ঞানীদের কর্মধারা শুধু যে আজকের দিনের মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে তা নয়, মারণাস্ত্র তৈরি বা বংশগতির ধারা বদলে দেওয়া এমনি ধরনের কোন কোন গবেষণা মানব সভ্যতার জন্য গুরুতর বিপদও ডেকে আনতে পারে। গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষই মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা। কিন্তু মানুষ এসব বিষয়ে তাদের মতামত বা সিদ্ধান্ত জানাতে পারে যদি তাদের মধ্যে সাধারণ সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা জন্মায়, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভাল-মন্দ তারা বিচার করতে পারে।

বিজ্ঞানের নতুন নতুন অগ্রগতির নানা বিষয়ে মানুষ জানতে চায়। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, পরমাণু-শক্তি, কম্পিউটার— এমনি কত বিষয় আজ মানুষের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাদের জীবনে ছায়া ফেলছে— সেসব কথা মানুষ বুঝতে চায়। এমনকি কালব্যাধি 'এইড্‌স্', জলবায়ুর পরিবর্তন, মহাকাশ গবেষণা, কৃষ্ণবিবর, জিন-প্রযুক্তি, 'তথ্য-বিপ্লব' এধরনের নানা বিষয়ও মানুষকে ভাবিয়ে তোলে; এসব নিয়েও মানুষের কৌতূহল কম নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান নিয়ে লেখা হতে পারে প্রধানত দু'ধরনের : শুধু বিজ্ঞানীদের জন্য, আর সাধারণ মানুষের জন্য। এই দু'ধরনের লেখার মধ্যে উদ্দিষ্ট পাঠকদের পার্থক্যের কারণে বিষয়বস্তুর জটিলতায় এবং প্রকাশভঙ্গিতে তফাত ঘটতে পারে অনেকখানি। যেমন, একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীদের জন্য যদি কেউ তাঁর গবেষণার বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখেন তাহলে তার ভাষা হতে পারে রীতিমতো পরিভাষায় ভারাক্রান্ত। আবার নানা ক্ষেত্রের বিজ্ঞানী যদি হন উদ্দিষ্ট পাঠক তাহলে 'রিভিউ' বা পর্যালোচনা-জাতীয় লেখায় বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি হতে পারে বেশি আর ভাষাও হতে পারে অপেক্ষাকৃত কম পরিভাষাযুক্ত।

সারা পৃথিবীতে আজ লাখখানেক বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাদের কোনটির প্রচারসংখ্যা মাত্র কয়েকশ', আবার কোনটির হয়তো বহু লক্ষ। এসব পত্রিকার প্রতিটির নিজস্ব স্টাইল বা প্রকাশভঙ্গি রয়েছে। কোন বিজ্ঞানী যদি বিশেষ একটি পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধ প্রকাশ করতে চান তাহলে তাঁকে সেই পত্রিকার লেখার বিশেষ ধাঁচটি অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু লেখাটি যদি হয় সাধারণ মানুষের জন্য তাহলে রচনাশৈলীর প্রশ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রা নেয়।

উদ্দিষ্ট পাঠক আর রচনাশৈলী

বিজ্ঞান নিয়ে লেখার ক্ষেত্রে রচনাশৈলীর কথা তুললেই লেখাটি কাদের জন্য সে প্রশ্নটি আগে ওঠে। পাঠকরা হতে পারেন নানা বয়স আর শিক্ষাগত যোগ্যতার, নানা পেশা আর সামাজিক পটভূমির মানুষ; তাঁরা হতে পারেন বয়স্ক নারী-পুরুষ বা শিশু-কিশোর; গ্রামবাসী বা শহরবাসী। সে সব পাঠকের সবার যে একই ধরনের বিষয়ে আগ্রহ থাকবে তাও নয়, বিভিন্ন জনের থাকতে পারে ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহের বিষয়। আর তাই আপনার লেখার ধাঁচ অনেকটাই নির্ভর করবে পাঠকদের বিশেষ ধরনের ওপরে।

কোন বিজ্ঞানী যখন সতীর্থ বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করার জন্য লিখতে বসেন তখন তিনি তাঁর পাঠকদের সে বিষয়ে বেশ খানিকটা পূর্বজ্ঞান আছে বলে ধরে নিতে পারেন। অবশ্য তাঁকে তাঁর পরীক্ষার পদ্ধতি ও উপাত্তের বর্ণনা এমন নিখুঁতভাবে দিতে হবে যেন আর কেউ একই পরীক্ষা করে তার সত্যাসত্য যাচাই করে দেখতে পারেন। তাছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞানীর গবেষণায় পাওয়া উপাত্তের উল্লেখ করতে হলে সেই সঙ্গে তার সূত্রও নির্দেশ করতে হয়।

পাঠ্যপুস্তক লেখার সময় রচনাশৈলী হবে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখা থেকে ভিন্ন ধরনের। এখানে বিষয়ের ব্যাপ্তি হয় বেশি, তথ্যের সমাবেশ হতে হয় সুবিন্যস্ত আর ভাষা হওয়া চাই যে বয়সের বা যে স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য লেখা হচ্ছে তার উপযোগী। আবার রচনাটি যদি হয় শিশু-কিশোর পাঠ্য কোন পত্রিকার জন্য তাহলে রচনার ভঙ্গি হবে অন্য সব রচনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে লেখককে গোড়া থেকেই ধরে নিতে হবে তাঁর পাঠকদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি বেশ সীমাবদ্ধ; তাই তাদের জন্য ব্যবহার করতে হবে অতি সরল ভাষা; আর আকর্ষণীয় ছবির সাহায্যে এবং আরো নানাভাবে পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। আবার রচনাটি যদি হয় বেতারে সম্প্রচারের জন্য তাহলে শ্রোতাদের আগ্রহ ধরে রাখতে হবে বক্তার বর্ণনা, বাচন-ভঙ্গি এবং প্রয়োজনমতো সহায়ক শব্দ সমাবেশের মাধ্যমে (যেমন পাখি বিষয়ে আলোচনা হলে নানারকম পাখির ডাক; ঝড়বৃষ্টি সম্পর্কে হলে মেঘের গর্জন)।

কাজেই উদ্দিষ্ট পাঠক শ্রোতার সঙ্গে মাধ্যমের প্রশ্নটিও বিবেচনায় আনতে হয়। নানা ধরনের মাধ্যমের ওপরে নির্ভর করে রচনাশৈলীতে যথেষ্ট তারতম্য দেখা দিতে পারে। যেমন, মাধ্যম হতে পারে : বিজ্ঞান পত্রিকা; সাহিত্যপত্র; পাঠ্যপুস্তক; বিজ্ঞান-সংবাদ; সংবাদপত্রে প্রবন্ধ বা ফিচার; বেতার বা টেলিভিশন কথিকা; জনসমক্ষে বক্তৃতা; অথবা বিশেষজ্ঞদের সামনে বক্তৃতা। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মেজাজও থাকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। একটি গুরুগম্ভীর সাময়িকীর জন্য যে ধরনের লেখা উপযোগী হবে, কোন চটুল রম্য সাপ্তাহিক পত্রিকায় হয়তো তা একেবারেই মানানসই হবে না। শিশু-কিশোরদের উপযোগী লেখাও হতে পারে প্রধানত শিক্ষামূলক অথবা প্রধানত বিনোদনমূলক ধাঁচের। আবার সংবাদপত্রের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা হতে পারে নিবন্ধ ধরনের, সাক্ষাৎকার ধরনের অথবা 'রিপোর্টাজ' ধরনের।

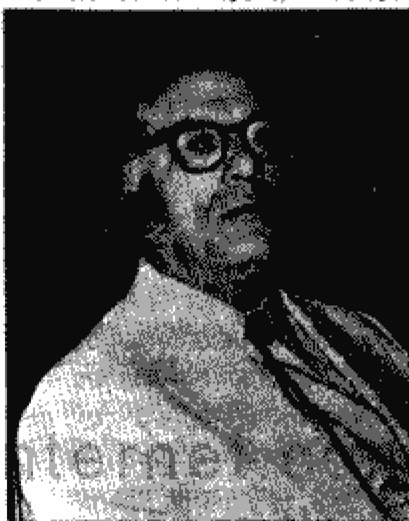
রচনাশৈলী অনেকটাই নির্ভর করে লেখকের নিজস্ব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর

'স্টাইল'-এর ওপরে। অন্যের স্টাইল বা শৈলী অনুকরণ করে খুব সার্থক লেখক হওয়া যায় না। কোন্ লেখকের রচনাভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত তা অন্য কারো পক্ষে বলে দেওয়া শক্ত। তবে বিজ্ঞান নিয়ে লিখে যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই এমন বিষয় বেছে নেন যা সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত— যা পাঠকের মনে আগ্রহ জাগাতে পারে; তাঁরা ভাষা ব্যবহার করেন সহজ এবং সরাসরি; বিজ্ঞানের বিমূর্ত জগতের সঙ্গে তাঁরা মানুষের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন; আর যেখানেই সম্ভব তাঁরা কিছুটা মানবিক আবেদনের মাধ্যমে বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চেষ্টা করেন।

সার্থক বিজ্ঞান লেখকেরা প্রায়শ নিছক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ না থেকে পাঠকের মনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান মুক্ত মন নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাতে, প্রকৃতির নিয়মাবলি উদ্ঘাটন করতে এবং সে সব নিয়মকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধান করতে শেখায়। অনুসন্ধিৎসা, বস্তুনিষ্ঠতা, কুসংস্কারমুক্ততা, যুক্তিবাদিতা, প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের জীবনকে আরো সুন্দর করে তোলা—এ সবই বিজ্ঞানের শিক্ষা। এই বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি আয়ত্ত না করে যেমন ভাল বিজ্ঞানী হওয়া যায় না তেমনি ভাল বিজ্ঞান-লেখকও হওয়া যায় না।

লেখক হলেন সেতুবন্ধ

বিজ্ঞান-লেখকের একটা প্রধান ভূমিকা হল বিজ্ঞানীর বিমূর্ত জগৎ আর সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনা করা। এই লেখক হতে পারেন গবেষণারত বিজ্ঞানী যিনি নিজের গবেষণার বিষয়ে বা তাঁর নিজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিষয়ে সাধারণ মানুষকে জানাতে চান। আবার লেখক হতে পারেন একজন সাংবাদিক যিনি বিজ্ঞানীদের কাজের ফল বা তার তাৎপর্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করতে চাইছেন। একালের একজন বহুপ্রজ বিজ্ঞান-লেখক আইজাক অ্যাসিমভ (১৯২০-৯২) নানা বিষয়ে চারশ'র ওপর বই লিখেছেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর শততম গ্রন্থ প্রকাশনা উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, "আমি আমার লেখায় গভীর পাণ্ডিত্য দেখাবার চেষ্টা করি না। ...আমার কাজ হল তরজমা করা। কোন বিষয়ে ডজনখানেক নীরস বই পড়ে আমি সে বিষয় নিয়ে একটি সরস বই লিখে ফেলি।"


আইজাক অ্যাসিমভ (১৯২০-৯২)

অ্যাসিমভ বিনয় প্রকাশ করে বলেছিলেন তাঁর তেমন কোন 'সৃষ্টিশীল অবদান নেই'; কিন্তু বিজ্ঞানী ও সাধারণ

মানুষের মধ্যে অথবা 'বৈজ্ঞানিক' ও 'মানবিক' সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার কাজটি তা বলে নেহাত সামান্য নয়। আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড হয়ে উঠেছে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের একটি প্রধান নিয়ামক আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান-সাক্ষরতার মধ্যেকার ফারাক যেন বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় এই ব্যবধান ঘোচাবার জন্য সেতুবন্ধ রচনার কাজটির গুরুত্বও ক্রমেই বাড়ছে।

বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার বিষয়টি আজ আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে এসব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সুফল ভোগ করার সুযোগ পায় নি বললেই চলে; আজ তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তাদের দীর্ঘকালের পশ্চাদপদতা ঝেড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে চাইছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক বিস্তার এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

অবশ্য সেতুবন্ধ রচনা করার ব্যাপারে কিছু সমস্যার কথাও মনে রাখতে হবে। সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজ করে লিখতে গিয়ে যেন তথ্যের যথার্থতা নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখা দরকার। সাংবাদিকদের সাধারণত বেশ চাপ আর ব্যস্ততার মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে খুব তাড়াহুড়ো করে লিখতে হয়; আর এমনি তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখার সময় তথ্য বা ব্যাখ্যায় কিছু ভুল ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিজ্ঞানের লেখায় এরকম ভুল শুধু যে বিজ্ঞানীদেরই খুব অপছন্দ তা নয়, এভাবে পাঠকদের মধ্যে ভুল ধারণার বিস্তার ঘটলে তাতে তাঁদের বা অন্যদের মারাত্মক ক্ষতিও হতে পারে। সেজন্য লেখার পর সেটি বিশেষজ্ঞদের দেখিয়ে নেওয়া বা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া নিরাপদ।

জনপ্রিয় পত্রপত্রিকায় লেখার এমনি আরেক রকম বিপদ হল লেখাকে ফেনানো বা বেশ জমকালো করে তোলা। অনেক সময় নতুন লেখকরা অতিমাত্রায় সাফল্য দাবি করতে, কিংবা নাটকীয় আবেদন বা রোমাঞ্চ সৃষ্টির চেষ্টা করতে প্রলুব্ধ হন। লেখাকে সরস করা আর তাকে ফেনিয়ে তোলার মধ্যে ভেদরেখা খুব সামান্য; কিন্তু অভিজ্ঞ লেখককে সেই সীমানা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। বিজ্ঞানের আজকের অগ্রগতি এমনিতেই এমন নাটকীয় যে, তাকে অতিরঞ্জিত করে দেখাবার কোন প্রয়োজন নেই। হয়তো নতুন আবিষ্কৃত কোন ওষুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বেশ কিছুটা বাড়িয়ে লেখা হল। কিছুদিন পর যখন দেখা যাবে সে ওষুধে তেমন কাজ হচ্ছে না তখন পাঠকদের আশাভঙ্গ হবে। তাতে লেখকের সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে। অবশ্য কখনো কখনো একজন উদ্ভাবকও তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে অতিরিক্ত দাবি করে বসতে পারেন। লেখককে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। অর্থাৎ লেখক তাঁর লেখার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে তারপর লেখাটি প্রকাশ করা উচিত। দরকার হলে অন্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য এসব কথার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞানে কল্পনার কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞানের

নানা ক্ষেত্রে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী– যেমন এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ ও আর্থার সি. ক্লার্কের মহাকাশ জয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আজ নাটকীয়ভাবে বাস্তব রূপ নিয়েছে। তবে বিজ্ঞান নিয়ে লিখতে গিয়ে কল্পনাকে বাস্তবের সীমার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর বেলায় এই সীমারেখা অপেক্ষাকৃত শিথিল। তবে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী আর বিজ্ঞান-রচনা যে এক নয় সেকথাও মনে রাখা দরকার।

তৃতীয় এক সমস্যা হল বক্তব্যের চেয়ে ভাষা বা প্রকাশভঙ্গির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া। লেখক কখনো কখনো তাঁর লেখাকে আকর্ষণীয় করতে গিয়ে কিছুটা অচেতনভাবেও এটা করতে পারেন। বিজ্ঞানলেখক বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ হলেও তাঁর রচনায় স্বভাবতই তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও প্রকাশভঙ্গির ছাপ পড়বে। সামাজিক পটভূমির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য তিনি হয়তো তাঁর লেখায় কিছুটা সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক চরিত্রও আরোপ করবেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখা দরকার ভাষার সজ্জা বেশি প্রাধান্য পেয়ে বৈজ্ঞানিক বক্তব্যটুকু যেন নিষ্প্রভ হয়ে না পড়ে। কখনও কখনও তরুণ বা অনভিজ্ঞ লেখকরা পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য লেখায় অপ্রয়োজনীয় জটিল বিষয়ের অবতারণা করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠক এ ধরনের লেখায় চমৎকৃত হন না, বরং এতে লেখার মান ক্ষুণ্ণ হয়।

শুরুটাই সবচেয়ে কঠিন

কোন বিজ্ঞানী যখন বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে লেখেন তখন তাঁকে রচনাশৈলী নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে হয় না ; সচরাচর তিনি সেই পত্রিকার প্রচলিত রচনাশৈলী অনুসরণ করেন। অবশ্য ভাষার প্রাঞ্জলতা ও তথ্যনিষ্ঠার বিষয়ে তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়; কিন্তু সাধারণ পাঠক তাঁর লেখা পড়ে কতটা বুঝবে তা নিয়ে তাঁর কোন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে না। তিনি যদি ইংরেজিতে লেখেন তাহলে তো কথাই নেই, তবে যদি এর আগে বাংলায় লেখার তাঁর তেমন অভ্যাস না থেকে থাকে তাহলে হয়তো পরিভাষার ব্যাপারটা কিছু সমস্যা সৃষ্টি করবে, কিন্তু তাতে রচনাশৈলীতে তেমন হেরফের ঘটবে না।

সে তুলনায় সাধারণ মানুষের জন্য লেখার ব্যাপারটা বেশ খানিকটা জটিল। এখানে লেখার ভাষা অবশ্যই হবে সাধারণ মানুষের ভাষা। হয়তো একজন বিজ্ঞানী লেখা শুরু করতে চাইবেন তাঁর প্রিয় কোন বিষয় নিয়ে যেমন যে বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন তার ওপরে। কিন্তু বিষয়টা এমন হওয়া চাই যা সাধারণ পাঠকদের কাছেও বেশ আকর্ষণীয় মনে হবে। অধিকাংশ লেখকের পক্ষেই লেখার বিষয়বস্তু স্থির করা আর লেখা শুরু করাটা সবচাইতে কঠিন বলে মনে হয়। কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে গেলে তার প্রথম অনুচ্ছেদটা রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। এটি একাধারে হওয়া চাই এমন সহজ, সরাসরি এবং আকর্ষণীয় যেন তা পাঠককে তার পরের বিষয়গুলোতে টেনে নেয়, সে বিষয়ে আরো জানতে আগ্রহী করে তোলে। আরম্ভটা ভাল হলে 'শুরুতেই কেল্লা ফতে' এ কথাটা খেটে যেতেও পারে।

লোকে সাধারণত এমন সব বিষয়ে জানতে চায় যেগুলো তাদের জীবনে প্রভাব



জে. বি. এস. হ্যালডেন (১৮৯২-১৯৬৪)

বিস্তার করে বলে সহজেই বোঝা যায়— যেমন, খরা, বন্যা, ঝড়বৃষ্টি, অসুখ-বিসুখ, চাষ-বাস, বনভূমির বিনাশ, পুষ্টি সমস্যা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি। এসব বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে এগুলোর পেছনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা আনা যায়। সমসাময়িক কোন সমস্যা নিয়ে লিখলে পাঠক সহজেই সে লেখা পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

এই শতাব্দীর একজন সেরা বিজ্ঞান-লেখক জেবিএস হ্যালডেন (১৮৯২-১৯৬৪) যে-কোন অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে লিখেও তাকে পাঠকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলতে পারতেন। একজন অতি উঁচুমানের জীববিজ্ঞানী হয়েও তিনি বিলেতের শ্রমিকদের পত্রিকা 'দ্য ডেইলি ওয়ার্কার'-এর জন্য প্রতি সপ্তাহে বিজ্ঞানের কোন বিষয় নিয়ে একটি করে প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি এসব রচনায় 'পোকামাকড়' বা 'ব্যাঙরা কেন আমার পছন্দ' এধরনের সাদামাটা বিষয় নিয়ে যেমন লিখতেন, তেমনি লিখতেন 'চিন্তাশীল যন্ত্রাদি' বা 'দর্শনের প্রয়োজন কি' এমনি সব জটিল বিষয় নিয়েও। তাঁর এসব রচনা ত্রিশ, চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে অনেকগুলো বইয়ের আকারে সঙ্কলিত হয়। পরে অবশ্য এক পর্যায়ে হ্যালডেন তাঁর মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভারতে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই মারা যান।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি হ্যালডেন একটি প্রবন্ধে তাঁর জনপ্রিয় রচনাশৈলীর কিছু কৌশল তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, "লেখা শেষ হবার পর সেটা কোন বন্ধুকে পড়তে দিন— বন্ধুটি যদি লেখাপড়া কম জানেন তাহলে আরো ভাল। কিংবা লেখাটি ছ'মাস ফেলে রেখে দেখুন তার পরও আপনি নিজে সেটা পড়ে বুঝতে পারেন কি না। হয়তো দেখবেন লেখার সময় যে সব বাক্য খুব সহজ মনে হয়েছিল এমন কিছু অংশ এখন বেশ জটিল ঠেকছে।" এরপর তিনি এ ধরনের জটিলতা কাটিয়ে ওঠার কিছু কৌশল বাতলেছেন। যেমন, যেখানে যেখানে সম্ভব লম্বা বাক্যকে ভেঙে ফেলে ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করুন; ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করুন; কোন ঘটনা বর্ণনা করে এক লাফে তার

কারণে না চলে গিয়ে কারণটা আগে বলে নিয়ে তারপর ধাপে ধাপে তার ফলাফলে গিয়ে পৌছান ইত্যাদি।

এসব সুপারিশ যদিও প্রধানত ইংরেজি ভাষার লেখকদের জন্য করা হয়েছিল তবু এগুলো সব দেশের এবং সব ভাষার জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের দেশের লেখকদের জন্য এর সঙ্গে আরো কিছু পরামর্শ যোগ করা যেতে পারে। যেমন: চলতি ভাষা আর সাধু ভাষার মিশেল যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখুন; বিধায়, অত্র, কতিপয়, যদিচ, তথাপি, ইহা—এ ধরনের পুরনো ধাঁচের শব্দ বর্জন করুন; 'কেবলমাত্র' না লিখে লিখুন 'কেবল' বা 'মাত্র', 'ফলশ্রুতিতে' না লিখে লিখুন 'ফলে'। লেখাটি পড়ার সময় ভেবে দেখুন আপনার পাঠক-পাঠিকা সহজে আপনার লেখার অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন কি না। পাঠকের পড়ার সুবিধের জন্য অপ্রচলিত শব্দের বদলে যথাসম্ভব সহজ ও প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করুন— যেমন 'গ্যাস নির্গত হয়' না লিখে বরং লিখুন 'গ্যাস বেরোয়', 'ভক্ষণ করা' না লিখে লিখুন 'খাওয়া', 'অভ্যন্তরে' না লিখে লিখুন 'ভেতরে'; ছোট ছোট বাক্যে যথাসম্ভব সঠিক ও স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করুন; তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে লিখুন; লেখার সঙ্গে সম্ভব হলে কিছু ছবি ব্যবহার করুন।

বিজ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রের কিছু নিজস্ব শব্দ-সমাহার আছে। জনপ্রিয় বিজ্ঞান-রচনায় এসব শব্দ কতখানি ব্যবহৃত হবে তা অনেকটাই নির্ভর করবে উদ্দিষ্ট পাঠকদের ধরনের ওপরে। অবশ্য ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার সব শ্রেণীর পাঠকের জন্যই সুবিধেজনক। খুব সহজ বাক্য ব্যবহার করেও অনেক গভীর বা জটিল ভাব প্রকাশ করা যায়— আমাদের সাহিত্যে তার বহু নজির রয়েছে। তবে সহজ ভাষায় জটিল ভাব প্রকাশ কিছুটা চেষ্টা ও যত্নসাপেক্ষ সেকথা মানতেই হবে। 'সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে' —বলেছেন ভাষার জাদুকর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। যে লেখকের মনে তাঁর নিজের বিষয় এবং পাঠকদের জন্য যথেষ্ট দরদ আছে তাঁর কাছে সহজ ভাষায় লেখার জন্য এই বাড়তি শ্রম সার্থক বলে মনে হবে।

এসব সমস্যা রয়েছে বলে বিজ্ঞান-লেখকদের নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। সারা পৃথিবীতে আজ বিজ্ঞানীদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে; সেই সঙ্গে বাড়ছে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা ধরনের লেখার চাহিদা। তার ফলে এ জাতীয় লেখার ঐতিহ্যও ক্রমেই সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই ঐতিহ্য হয়তো আজও কবিতা বা নাটকের ঐতিহ্যের মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি, কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে লেখার গুরুত্ব ও মর্যাদা যে ভবিষ্যতে আরো বাড়তে থাকবে তা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এক গৌরবময় ঐতিহ্য

সৌভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখার এক দীর্ঘকালীন ও গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি আধুনিক বাংলা গদ্যের উদ্ভবের প্রায় শুরু থেকেই বিজ্ঞান নিয়ে লেখারও সূত্রপাত ঘটে। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের সেকালের দিকপালরা এই ঐতিহ্যকে

শক্তিশালী করে তুলেছেন।

বাংলা ভাষায় শুধু যে সাহিত্যসেবীরাই এক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তা নয়, বাংলাভাষী প্রায় সব প্রথম সারির বিজ্ঞানীও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান আলোচনায় এগিয়ে এসেছেন। জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭) প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবদানের জন্য তাঁদের খ্যাতি দেশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বিদেশেও বিস্তৃত।

এঁদের নাম উল্লেখ শুধু আজকের বিজ্ঞান-লেখকদের মনে করিয়ে দেবার জন্য যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা এক সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হলে আরো প্রাঞ্জল, আরো আকর্ষণীয় রচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে দেশের ব্যাপক জনসমাজের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ তাঁদের নিতে হবে।

বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা লেখেন তাঁদের কখনো কখনো এরকম একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়: বিজ্ঞান নিয়ে লেখা আসলে কতটা বিজ্ঞান আর কতখানি শিল্পকলা বা সাহিত্য? —এ প্রশ্নের কোন সর্বজনীন বা চূড়ান্ত জবাব দেওয়া শক্ত। কেননা সে জবাব অনেকটাই নির্ভর করবে লেখক, তার নিজস্ব রচনাভঙ্গি এবং পাঠক ভুবনের ওপর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একেবারে জীবন সায়াহ্নে এসে 'বিশ্ব-পরিচয়' নামে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই লিখেছিলেন। এ বইতে তিনি রীতিমতো 'সাহিত্যিক' ভাষা ব্যবহার করেছেন— তাতে ছড়ানো অসংখ্য কাব্যময় উপমা। এ রকম ভাষার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের জন্য খুব স্বাভাবিক ছিল ; কিন্তু এ ভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে লিখে সার্থকতা লাভ সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

আসলে প্রত্যেক লেখকেরই রয়েছে নিজস্ব পরিমণ্ডল ও অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে নিজের ব্যক্তিসত্তা। এসবের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তাঁর নিজের বিশেষ রচনাভঙ্গি। প্রত্যেকের জন্য তাঁর নিজের রচনাভঙ্গিই তাই সবচেয়ে উপযোগী। আর সে রচনাশৈলী যদি পাঠকদের মনোপূত হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে সার্থক।

বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান আন্দোলন

আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চা সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার প্রভাবে আজ মলিন ও নিষ্প্রভ— একথা প্রমাণ করার জন্য কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে হয় না। একে বহু শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের জগদ্দল পাথর; তার ওপর পাশ্চাত্যে গত দু'শতাব্দী ধরে যন্ত্রকৌশল আর উৎপাদন শক্তির যে বিপুল বিকাশ ঘটেছে, এদেশে তা প্রতিহত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নির্মম পেষণে। এ অবস্থায় বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নিরক্ত আর বিবর্ণ না হওয়াটাই বরং আশ্চর্য।

এই আশ্চর্যের নানা সমাহারের মধ্যেও যেটা কিছুটা দুর্বোধ্য সে হল তবু তো আমরা গত পাঁচ দশকে দু'দু'বার স্বাধীন হয়েছি। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও দেখতে দেখতে সিকি শতক পেরিয়ে গিয়েছে, তবু কেন আমরা আজো বিজ্ঞানচর্চার পথে মোটেই তেমন এগোতে পারছি না? আমাদের পাশের দেশ ভারত আজ শিল্পবিকাশের পথে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণায় বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের জনশক্তি পৃথিবীর যে-কোন অগ্রসর দেশের সঙ্গে তুলনা করা চলে। আর কিছুটা পুবে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, এসব দেশও তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে মোটামুটি গত তিন-চার দশকের মধ্যে।

আমাদের চারপাশের নানা বিচিত্র দ্বন্দ্বের মতো এদেশে আজ একাধারে বিজ্ঞানের অস্তিত্বের দুর্বলতা যেমন প্রকট, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত বিজ্ঞানচর্চার জরুরি প্রয়োজন। ব্যাপক অস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে অনগ্রসরতা, অতি নিম্নমানের উৎপাদন পদ্ধতি, খাদ্য ঘাটতি, জনসংখ্যার বিপুল হারে বৃদ্ধি, সর্বব্যাপী দারিদ্র— এসব সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার আর প্রয়োগ ছাড়া ঘটবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জন্য, জনগণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য এদেশের মানুষের যে ধারাবাহিক সংগ্রাম তার মধ্য দিয়ে বিদেশী প্রভুত্বের বজ্রমুঠি শিথিল হবার ফলে এই অতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান চেতনাও তাই ক্রমে ক্রমে জনসমাজে, বিশেষ করে এদেশের তরুণ সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে।

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ দর্শন আর কাব্য, শিল্প আর সঙ্গীতের অনুরক্ত বলে পরিচিত। এদেশের মানুষের অতীন্দ্রিয়-আশ্রয়ী জীবনদর্শন আর পরম সুন্দরের জন্য আবেগতাড়িত মোহাবিষ্টতা যতটা আলোচিত হয়, ততটা আলোচিত

নয় তাদের প্রশ্নশীলতা, কর্মকুশলতা আর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে নিষ্ঠা। এদেশের মানুষের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ যেমন জন্ম দিয়েছে মহান কাব্যের, তেমনি মানুষ ফুঁসে উঠেছে মাতৃভাষার জন্য রক্তক্ষয়ী মহৎ সংগ্রামে। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি ব্যাপক অনুরাগের প্রকাশ এদেশে দেখা গিয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে। এবং এ-কারণেই তা সবার চোখে হয়তো আজো তেমন স্পষ্ট নয় এবং যে অন্তর্লীন বিজ্ঞান চেতনা দেশের দিকে দিকে বিস্তৃত হচ্ছে তা তাই আরো বেশি তাৎপর্যময়।

এই অনুরাগের সবচাইতে স্পষ্ট ও গভীর প্রকাশ ঘটেছে তরুণ সমাজের মধ্যে। এটাই স্বভাবিক। মনে রাখতে হবে অতি দুর্বল একটি শিক্ষা ব্যবস্থাতেও গত দু'যুগে মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে আড়াই থেকে তিনগুণ; আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ পর্যায় থেকে শুরু হয়েছিল বলে আজ তার আপেক্ষিক বৃদ্ধি কিছুটা দৃষ্টিগ্রাহ্য। যেখানে মাত্র দেড় যুগ আগেও মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় আদৌ কোন "বিজ্ঞান বিভাগ" ছিল না, সেখানে আজ মোট আট লক্ষ পরীক্ষার্থীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরীক্ষা দেয় বিজ্ঞান বিভাগে (উচ্চ মাধ্যমিকে এই হার এর প্রায় অর্ধেক)। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন আরম্ভ হওয়ায় প্রাথমিক স্তরে আজ যে বিপুল সংখ্যায় শিক্ষার্থী এসে যোগ দিচ্ছে আগামী ক'বছরের মধ্যে তাদের একটা বিরাট অংশ মাধ্যমিক স্তরে এসে ঢুকতে শুরু করবে।

বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে দেশের নানা প্রান্তে আজ প্রায় চারশ' বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে, যেখানে প্রাথমিকভাবে হলেও এই কিশোর-কিশোরীরা বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারা যেমন তাদের সহজাত কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে চাইছে তেমনি চাইছে এদেশের মানুষের গভীর দারিদ্র্যের নিরসনে কিছুটা প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে।

মূল্যবোধের পরিবর্তন

যে রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটেছে, তার ফলে এদেশের তরুণ সমাজের মধ্যে মূল্যবোধের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রবল পরাক্রমশালী হানাদার বাহিনীকে পরাভূত করার মধ্য দিয়ে তারা লাভ করেছে এক গভীর আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস বিস্তৃত হয়েছে দেশের ভবিষ্যতের ওপর আস্থায়, জনগণের প্রতি বিশ্বাসে এবং জনগণের কল্যাণে সমাজ ও প্রকৃতির রূপান্তর সাধনের সম্ভাবনায়। অন্ধ নিয়তির ওপর চিরাচরিত মোহাবিষ্ট নির্ভরতা নয়; আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানের হাতিয়ার নিয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ানো, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় উদ্‌ঘাটন করা প্রকৃতির রহস্য, আর তাকে কাজে লাগানো নিগৃহীত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে—এই আদর্শ স্বভাবত আকৃষ্ট করে তরুণের মনকে।

এছাড়া বাংলাদেশের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে এদেশের তরুণ সমাজ অকস্মাৎ দাঁড়িয়েছে বিশ্বের তরুণ সমাজের কাছাকাছি, সমান মর্যাদার আসনে, এক কাতারে। এদেশের মুক্তিকামী মানুষের প্রতি বিশ্বের কৌতূহল যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে সারা দুনিয়ার সঙ্গে এদেশের মানুষের যোগাযোগ। অন্যান্য অগ্রসর ও উন্নয়নকামী দেশের

বিজ্ঞান-প্রগতির ধারা থেকে এদেশের তরুণ সমাজের বিচ্ছিন্ন থাকা হয়ে উঠেছে দুঃসাধ্য।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কিছুদিনের মধ্যে একটি দু'টি করে ক্রমে ক্রমে দেশের নানা জায়গায় যে সব বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্ভব ঘটেছে তা এই ধারারই বহিঃপ্রকাশ। এসব ক্লাবের সৃষ্টি আকস্মিক বা দৈব যোগাযোগের ব্যাপার নয়— একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনেই এদের উৎপত্তি। আর এই সামাজিক প্রয়োজনেই এদের কর্মধারা ব্যাপক ও সুসংগঠিত করার সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে।

বিজ্ঞান ক্লাবের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল এর সাহায্যে বিজ্ঞানচর্চাকে শ্রেণীকক্ষের আনুষ্ঠানিক আর অনেকটা নিরানন্দ পরিমণ্ডল থেকে কর্মমুখী, আনন্দময় পরিমণ্ডলে নিয়ে আসা যায়। সে হিসেবে এগুলো একাধারে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক, অন্যদিকে বিনোদনের সহায়ক। এতদিন আমরা সংস্কৃতিচর্চা বা বিনোদনের উপকরণ বলতে সচরাচর খেলাধুলো, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য এসবই বুঝতাম। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা যে মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি, বিশেষত শিশু-কিশোরদের মধ্যে, আর অনুসন্ধিৎসার চর্চা যে এক পরম বিনোদনের উপকরণ হতে পারে একথা আমাদের দেশে সেভাবে তেমন বিবেচিত হয় নি। কাজেই শখ হিসেবে, আনন্দের উপকরণ হিসেবে, তরুণ সমাজের কৌতূহল নিবৃত্তি ও গঠনমূলক কাজের অবলম্বন হিসেবে বিজ্ঞান ক্লাবের অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

আর ঠিক এ কারণেই এই প্রচেষ্টায় বড়দের, বিশেষ করে শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের কাজ তো শুধু শ্রেণীকক্ষে পাঠদান নয়, তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করাও। যেসব ছেলেমেয়ে বিজ্ঞান ক্লাবে কাজ করে আনন্দ পাচ্ছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যতে প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী হয়ে উঠবে। কিন্তু যে হয়তো বড় হয়ে পেশায় বিজ্ঞানী হবে না, তারও তো শখ হিসেবে বিজ্ঞানচর্চা করতে বা তা থেকে আনন্দ পেতে বাধা নেই। যেমন বাধা নেই যে বিজ্ঞানী হবে তার শখ হিসেবে খেলাধুলো করতে কিংবা সঙ্গীত বা চিত্রকলার চর্চা করতে।

বিজ্ঞানীদের সহায়তা দরকার বিশেষ করে ক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের কৌতূহলকে যথাযথভাবে সমস্যামুখী করে তুলতে, গতানুগতিক পরীক্ষায় আবদ্ধ না থেকে উদ্ভাবনমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন নতুন অজানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে। এ ধরনের বিজ্ঞানী হতে পারেন শিক্ষাব্রতী, গবেষণাকর্মী, কৃষিকর্মী, চিকিৎসাবিদ বা বিজ্ঞানের আর কোন বিভাগের বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো গবেষণাগারের পরীক্ষায় বা বাইরের প্রকৃতির ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ বা প্রয়োগমূলক ক্রিয়াকর্মে ক্লাবের সদস্যদের সহায়তা দিতে পারবেন।

ক্লাবগুলোর মধ্যে সচরাচর দু'ধরনের গড়ন দেখা যায় : ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল বা কলেজ)-ভিত্তিক সংগঠন, খ. পাড়া, শহর বা অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন। দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানেরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। অভিভাবকদের বা স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতাও দু'ধরনের গড়নেই পাওয়া যেতে পারে।

ক্লাবের কার্যক্রমের মধ্যে সাধারণত কতকগুলো বড় রকমের ভাগ করা যেতে পারে, যেমন :

১. নিজেকে এবং নিজের চারপাশের প্রকৃতি আর পরিবেশকে / দেশকে জানা;
২. প্রকৃতির নিয়মকানুন জানা— সে জন্য পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;
৩. দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক কাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা;
৪. ওই সব বিভিন্ন ধরনের কাজের ওপর 'প্রজেক্ট' সম্পন্ন করা অর্থাৎ হাতে-নাতে কাজের মধ্য দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান করা;
৫. বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া— সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেয়া;
৬. দলগতভাবে সংগঠনমূলক কাজ করা।

এসব কার্যক্রম যে শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের সহায়ক তা নয়, তরুণ-তরুণীদের মানসিক বিকাশ, চিন্তাশক্তির উন্মেষ, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ও সামাজিক গুণাগুণ অর্জন— এক কথায় চরিত্র গঠনে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

কৌতূহল থেকে বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের জন্মই হয়েছে মানুষের অপরিসীম কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা থেকে। তাই এই কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসাই হল বিজ্ঞান ক্লাবের কার্যক্রমের একটি প্রধান অবলম্বন। কৌতূহলের নিবৃত্তি থেকে মানুষ আনন্দ পায়। আর এই কৌতূহল বিশেষ করে প্রবল থাকে শৈশবে, কৈশোরে আর উঠতি যৌবনে। এই অনুসন্ধিৎসার মধ্য দিয়ে তরুণ কিশোর আবিষ্কার করে তার চেনা-জানা জগতের সত্যিকার রূপকে, তার নিজের শক্তি আর সম্ভাবনাকে। পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে কৌতূহল নিবৃত্তির সূত্রপাত থেকে ক্রমে ক্রমে তা পরীক্ষণের রূপ নেয়। তারপর এই পরীক্ষণ থেকে উদ্ভব ঘটে প্রয়োগের।

বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য-সদস্যারা তাদের প্রাথমিক ধরনের পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে শেখে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের কায়দা-কৌশল। তার ফলে আর দশজনের চোখে যা ধরা পড়ে না তাও ধরা পড়ে তাদের চোখে। পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যকে তারা বিশ্লেষণও করতে শেখে। তেমনি তাদের আয়ত্ত হয় পরীক্ষণের পদ্ধতি; প্রশ্ন তোলার কৌশল; প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য কিভাবে পরীক্ষণটা ঠিকভাবে সাজাতে হবে তা স্থির করার মুনশিয়ানা। পরীক্ষণ থেকে যথার্থ তথ্য সংগ্রহের নিপুণতা। যন্ত্রপাতি এবং আরো নানা উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা। কোন্ তথ্যটা নির্ভরযোগ্য আর কোন্টা নয় তা বাছাইয়ের ক্ষমতা। এ ক্ষমতা যে শুধু বিজ্ঞানী হবার জন্য দরকার তা নয়, প্রতিটি মানুষেরই থাকতে হবে এসব গুণ।

এছাড়া বিজ্ঞান ক্লাবের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আর পদ্ধতিকে ছড়িয়ে দেয়া যায় সমাজের সব মানুষের মধ্যে। দিন-রাত হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে সমাজের উৎপাদন ঘটায় যে মানুষ আর বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে চারপাশের প্রকৃতি আর

সমাজকে বদলাতে পারে যে মানুষ তাদের মধ্যে। এই জ্ঞানের সাহায্যে বাড়ে সে সব মানুষের ক্ষমতা— তারা উৎপাদন করতে পারে আরো বেশি, প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে পারে আরো নিপুণতার সঙ্গে।

সংগঠনের দিকটি বিজ্ঞান ক্লাবের কাজের একটি বড় দিক। আসলে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার বা প্রকৃতির রূপান্তর মানুষের একটি বড় ধরনের সামাজিক দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালন ব্যাপক সাংগঠনিক উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়। দেশের প্রকৃতির, মানুষের বা সমাজের বড় রকম রূপান্তর ঘটাতে হলে সারা দেশের তরুণ সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বিজ্ঞান আন্দোলনে। আর সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে বিজ্ঞানকে। সাম্প্রতিককালে যেসব দেশে বড় ধরনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে সে সব দেশের তরুণ সমাজকেই সেজন্য প্রধানত উদ্যোগ নিতে হয়েছে।

বাংলাদেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলো এখনো প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। তবে এগুলোর সামনে সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কেননা এক বিশাল আর মহৎ দায়িত্ব পালন করতে চলেছে এই স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞান ক্লাব। এই ক্লাবগুলো ক্রমেই আরো প্রসার লাভ করবে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুণগত উৎকর্ষ ঘটবে, দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানমনা তরুণসমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বাড়বে— আর সবচেয়ে বড় কথা, এদেশের মানুষের সঙ্গে, তাদের জীবনের সমস্যার সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হবে। তারপর এদের মধ্য থেকেই উদ্ভব ঘটবে এদেশের ব্যাপকতর বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব।

একদিন এই আন্দোলনে অংশীদার হবে সারা দেশের তরুণসমাজ, সারা দেশের মানুষ। আর যখন সারা দেশের মানুষ বিজ্ঞানমনা হয়ে উঠবে, প্রকৃতির নানা অজানা রহস্য উদ্ঘাটন করতে এগিয়ে আসবে, বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে নিজেদের জীবনকে সুন্দর আর সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবে শুধু তখনই এদেশে বিজ্ঞানের সত্যিকার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটবে।
